গুঞ্জন

গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন

বেশ গুড়গুড় করে এসে গেল বসন্ত ঋতু, আর বসন্ত মানেই নবীনতা, প্রাণবন্ততা, সজীবতা। দৈনন্দিন জীবনের ওঠা-পড়া... সে তো সব সময়ই আছে, কিন্তু শীত যেমন প্রকৃতির প্রাণ প্রবাহকে সঙ্কুচিত করে, ঠিক তার পরেই বসন্ত নিয়ে আসে নতুন উন্মাদনার আমেজ। বাংলার মাটিতে বসন্ত ঋতুর এক বিশেষ ভূমিকা আছে। এই ঋতুতেই পরপর আসে তিনটি উৎসব – বাসন্তী পূজা, চড়ক পুজো এবং দোলযাত্রা। বাঙালি মন যতই আধুনিক হোক, যখন আসে দোল বাঙালির প্রাণ আজও বলে ওঠে 'খোল দ্বার খোল'...

মাসিক ই-পত্রিকা

বর্ষ ১, সংখ্যা ১০
মার্চ ২০২০

রহস্য সংখ্যা

কলম হাতে

নাহার আলম, সুভাষ মুখার্জী, স্বাগতা পাঠক, ডাঃ অমিত চৌধুরী, পত্রালিকা বিশ্বাস, পিয়ালী চ্যাটার্জী মল্লিক এবং পাণ্ডুলিপির অন্যান্য সদস্যরা...

প্রকাশনা

পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)

বি.দ্র.: লিটল ম্যাগাজিন হিসাবে মুদ্রিত এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ হয় ইং ১৯৭৭ সালে...

যোগাযোগের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

পায়ে পায়ে

বাংলা বছরের শেষ লগ্নে এক নতুন ভাবনা নিয়ে 'গুঞ্জন'এর পাতায় নতুন চমক। প্রাত্যহিক জীবনের সাথে রহস্য নানভাবে জড়িয়ে আছে। মানুষের মনস্তাত্ত্বিক ভাবনাকে কেন্দ্র করে আছে রহস্যের এক চেনা-তবু-অচেনা পরিবেশ। যেখানে চরিত্রের নানা অন্ধকার দিক ফুটে ওঠে, আর থাকে কৌতূহলের ছায়া। সেই কৌতূহলের ছায়ার নিবিড়ে সুপ্ত থাকে কোন এক অজানা সন্ধানের আভাস।

কিছু সুলেখক ও সুলেখিকারা এই সংখ্যায় গুঞ্জনের রহস্য বিভাগের পাতায় রহস্যের সেই বহুমুখী দিকগুলিকে তুলে ধরেছেন। এছাড়া ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনীদ্বয় ইতিমধ্যে পাঠকবর্গের কাছে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। শুধু দুই বাংলা নয়, প্রবাসী বন্ধুরাও 'গুঞ্জন'এর লেখক-লেখিকাদেরে লেখার প্রতি বিশেষ অনুরাগী।

সকল বাংলা-ভালোবাসি মানুষদের কাছে বাংলা ভাষার সাহিত্যকর্মকে পৌঁছে দেওয়ার এই প্রয়াস নিয়ে গুঞ্জনের অনন্ত পথ চলা। 'পাণ্ডুলিপি'র সকল সদস্যদের কাছে অনুরোধ, তাঁদের লেখার পাশাপাশি সর্ব প্রকার লেখার গুনমান সম্পর্কে যথাযথ মতামত বা সম-আলোচনা আমাদের ই-মেল করুন। সাহিত্যকে সুসমৃদ্ধ করাই আমাদের সকলের একমাত্র উদ্দেশ্য। ■

বিনীতা — রাজশ্রী দত্ত, সম্পাদিকা, গুঞ্জন

কলম হাতে

প্রচ্ছদ চিত্রঃ গুঞ্জনের শিল্পী গোষ্ঠী

শ্রী

নিজেকে

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পি. কে.)

আজ থাক,
অমন করে এগোতে চেওনা তুমি।
ছায়ায় ভরেছে পথ।
কখনও কি মনে হয় না তোমার,
ওরাও তোমায় ডাকে?

প্রহরীর বেশ ধরে, কেউ এখানে নেই।
পায়ের সামনে রাখলে পা,
এগোতে তুমি তো পারই...

অন্ধকারের গহনে তোমার আগে ও পরে
অনেকেই গুটি গুটি চলে।

বেমালুম অভিসারের পথে, শ্বাস ওদের দীর্ঘ।
জানি, তুমিও গভীর শ্বাস নাও –
কিন্তু তুমি কি বোঝো না,
শ্বাস দীর্ঘ হোলেই তা দীর্ঘশ্বাস নয়?
আজ থাক।

ভেবে দেখো, তুমিও অনায়াসেই যেতে পার,
কিন্তু কেন যাবে? ■

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন

পত্রালিকা বিশ্বাস

(১)

চোখে কালো সানগ্লাসটা লাগিয়ে হন্তদন্ত হয়ে স্টেশনের দিকে হেঁটে যাচ্ছে রজত। তিন রাস্তার মোড়টা পার হতেই, পাশের চায়ের দোকান থেকে আওয়াজ আসে – "কি ব্যাপার বস, হিরো সেজে চললে কোথায়? আজকাল কি আমাদের আর পোষাচ্ছে না, আড্ডায় আর আসছ না যে! শহুরে মেয়ে দেখে ঝাড়ি মারবে, পাছে বুঝতে না পারে তাই সানগ্লাস নাকি?" রজত কোনো কথার উত্তর না দিয়ে চায়ের দোকানে বসা রাজুদার দিকে একটুকরো হাসি দিয়ে ছুট লাগায়। ১০:১৫ র ট্রেনটা না ধরলে অফিসে ঢুকতে লেট হয়ে যাবে। ট্রেনে উঠে এক কোনে কোনরকমে একটা দাঁড়ানোর জায়গা করে নিয়ে, সে ভাবতে থাকে – আজ চারদিন ধরে চোখটা লাল হয়ে আছে, সঙ্গে যন্ত্রণা, আলোয় তাকানো যাচ্ছেনা বলেই এই কালো চশমার আশ্রয়। কিচ্ছু না জেনেই কেমন মন্তব্য ছুড়ে দিলো রাজুদা...

এক অসুস্থ ব্যক্তির চশমা দেখেও লোকে মন্তব্য করে...

বিবেক

(২)

ক্লাস এইটে পড়া ঋজুকে ওর মা বাড়ির সামনের মাঠেই ধরে ধরে হাঁটছে। মাঝে মাঝে ছেড়ে দিলেই পড়ে যাচ্ছে ঋজু। আবার অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়াচ্ছে মায়ের হাতটা ধরে। আবার হাঁটছে এক পা দু'পা করে। আর মায়ের মুখটা আলো হয়ে উঠছে। এই দেখে পাশের বেঞ্চে বসা দুই মহিলার একজন বলে উঠলেন ধেড়ে ছেলে এখনও মায়ের হাত ধরে হাঁটছে, মায়েরও আদিখ্যেতা দেখো। কোনো কাজ না থাকলে যা হয় আর কি। ওরা কেউ জানত না সুস্থ স্বাভাবিক ঋজুর পা দুটো হঠাৎই বেঁকে যায় এই বছর দুই আগে থেকে। এ এক বিরল রোগ। দুটো পায়েই দুবার অস্ত্রোপচারের পর, এখন ঋজু আবার নতুন করে হাঁটা শিখছে...

এক বিরল রোগের শিকারকে দেখেও লোকে হাসে...

(৩)

এবার পুজোর অষ্টমীতে মঞ্চে অন্তাক্ষরী প্রতিযোগিতায় শালিনীও যোগ দিয়েছে। অনেক দিন চর্চা না থাকলেও আবার সবার সামনে গান করতে

বিবেক

খুব ইচ্ছে করছিল ওর। সুযোগ আসতেই শুরু করলো - লাগ যা গলে ফির হাসি রাত হো না হো। হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে থেকে কে যেন বলে উঠলো - এ মাগো এই ফাটা বাঁশের মত গলা নিয়ে আবার গান গাইতে মঞ্চে! আর সঙ্গে সঙ্গে হাসির শব্দে ভরে উঠলো চারপাশটা। মাথা নীচু করে কাঁদতে কাঁদতে নেমে এলো শালিনী। ওই ভিড়ের মধ্যে যে বললো, আর যারা হাসলো তারা কেউই জানতো না এক বছর আগে গলায় ক্যান্সার ধরা পড়েছিল শালিনীর। অস্ত্রপ্রচার, রেডিয়েশন এসবের পরে সবকিছু একই আছে শুধু আমূল বদলে গেছে তার কণ্ঠস্বর।

এক ক্যান্সার পীড়িত মানুষের গলার আওয়াজ শুনেও লোকে হাসে...

"রোজ কত কি ঘটে যাহা তাহা"

হ্যাঁ এরকম ঘটনা রোজ ঘটছে। আমরা না জেনেই কতরকম মন্তব্য করে আমাদের আশেপাশে যারা সারাক্ষণ লড়াই করে যাচ্ছে তাদের ভেঙে গুঁড়িয়ে দিচ্ছি। কথায় বলে মুখের কথা আর ধনুকের তীর একবার বেড়িয়ে গেলে আর

ফেরানো যায় না। তবু ভেবেচিন্তে কথা বলতে হবে ভাবলেই আমাদের গায়ে জ্বর আসে। এই দেখুন তো তাপস পাল এত বড় মাপের অভিনেতা হয়েও তাঁর বলা একটা কথায় তাঁর জীবন কেমন বদলে গেল, মৃত্যুর পরেও মানুষ তাঁকে ছেড়ে কথা বলেনি।

মন্তব্য বা সমালোচনা করার আগে যার সম্বন্ধে করছেন একটু তার জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখুন তো, আপনি ঐ জায়গায় হলে পারবেন তো তার কষ্টগুলো নিজের কাঁধে বইতে? কিছু মানুষ অনেক মেঘলা দিনেও এক চিলতে রোদ্দুর খুঁজে নেয়, আর কিছু মানুষ হাজার ওয়াটের আলোর মাঝেও অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ায়... ■

নমামি দেবী নর্মদে

শিব দুহিতা নর্মদা

ডাঃ অমিত চৌধুরী

(৯)

পিছন ফিরে দেখি এক মাতাজী হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি হ্যাঁ বলাতে তিনি তাঁর বাড়িতে আমাদের রাত্রে থাকতে অনুরোধ করলেন। আমরা বিনা বাক্য ব্যয়ে থাকতে রাজী হয়ে গেলাম। ওনারা স্বামী-স্ত্রী পরিক্রমা করেছেন, এবং ফিরে আসার পরে ওনার স্বামী মারা যান। তার পর থেকে উনি পরিক্রমাকারীদের সেবা করেন বিভিন্ন ভাবে। উনি আমাদের খুব যত্ন করলেন। এই গ্রামটির নাম আরিয়া। রাত্রে খুব বৃষ্টি হয়েছে, তাই পরিবেশ খুব ঠাণ্ডা।

আমরা খুব ভোরেই চলা শুরু করেছি। পথের শেষ কোথায় জানিনা। কোনো সুভাষিণী এখনও বলেনি, "...পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ?" যদিও আমরা পথ হারাইনি। দিব্যানন্দজী আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন। জঙ্গল ভেদ করে, গ্রাম ও শহরকে পিছনে রেখে আমরা এগিয়ে চলেছি, যেমন নদী এগিয়ে যায় সাগরের দিকে। মূলাধার থেকে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি যেমন এগিয়ে যান সহস্রারার দিকে। আগে নর্মদা পরিক্রমা খুব কষ্ট সাধ্য ছিল, এখন ঠিক অতটা না হলেও, বেশ কষ্ট হয়। তার মধ্যে তিনটি ভয়ঙ্কর জঙ্গলের প্রথমটি মুণ্ডমারণ্যর জঙ্গল

নমামি দেবী নর্মদে

আমরা অতিক্রম করছি। সকালে খুব কুয়াশা, তাই চলতে কষ্ট হচ্ছে, প্রায় সাড়ে দশটার সময় মার্তণ্ড ভৈরবের দর্শন পেলাম স্বমহিমায়। ১৫ কিলোমিটার হেঁটে আমরা এলাম দেবগাঁও সঙ্গমে। এখানে নর্মদা সঙ্গম করেছেন বুটন নদীর সাথে। খুবই পবিত্র স্থান।

এটি পরশুরামের পিতা ঋষি জমদগ্নির তপস্থলী। নর্মদা তটে উত্তর দক্ষিন মিলিয়ে অনেক জায়গাতেই উনি তপস্যা করেছেন, তার মধ্যে এটিও একটি। স্নান করেই চলে যাব, কিন্ত একজন আশ্রমিক ভোজন প্রসাদ নিয়ে যেতে বলাতে অপেক্ষা করতে হল, এর মধ্যে এক সাধু শিবের পঞ্চামৃত দিয়ে গেলেন এক লোটা করে। প্রথম কিছু পড়ল পেটে। ভোজনের পরে বেড়িয়ে পড়েছি, খরস্রোতা নদী পেড়তে হবে প্রায় এক কিলোমিটার, আড়াআড়ি ভাবে। এমন সময় তিনটি বাচ্চা ছেলে ছুটে এল এবং আমাকে ধরে ব্যাগ নিয়ে খুব যত্ন করে নদী পাড় করে দিল। আমি ওদের ডাকিনি, পায়ে ফোস্কা, তাই পা পাথরে দিতে পারছি না। ওরা তুলে নিয়ে পাড়ে এল। আমি চোখ বন্ধ করে গুরু কে বলছি – “আমার জীবন নদীর ওপারে, এসে দাঁড়ায়ও, দাঁড়ায়ও বঁধু হে।” ...ক্রমশ ■

বিশেষ ঘোষণা

গুঞ্জনে প্রতি মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্তই পরের (মাসের) সংখ্যার জন্য লেখা গ্রহণ করা হয়।

ছায়া-কায়া

রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা)

(১২)

জয়ের ঘরটা আজ একটু অন্যভাবে সাজানো হয়েছে। চারিদিকের জানালাগুলো খোলা প্রতিটি জানালায় একটি করে ত্রিশূল আটকানো। ঘরের ভিতর ধুপ-ধুনো জ্বলছে। ঘরের মাঝে স্বস্তিকা চিহ্ন আঁকা রয়েছে, তার ওপর একটি টেবিল পাতা; সেই টেবিলেও স্বস্তিকা চিহ্ন অঙ্কিত আছে। আর তার চারপাশে চারটি চেয়ার, যা একটি লাল সুতো দিয়ে বাঁধা। টেবিলের সামনে একটা হোমকুণ্ড এবং পূর্ব দিকে মুখ করে একটা আসন পাতা আছে। ঘরে শুধু মোমবাতির আলো। রঞ্জনা এইসব দেখে হতভম্ব হয়ে যায়। ব্রজবাবু রঞ্জনার মাথায় হাত রেখে বলেন, “মা, আমি জানি তুমি এসব দেখে খুবই অবাক হয়েছ। তোমার মামা আমার ছাত্র। তোমার মামা তোমার আর জয়ের সম্পর্কের টানাপড়েনের সব কথা আমাকে জানিয়েছিল। আমি জয়ের রিপোর্টগুলো দেখেছি। তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় জয় আর কোনোদিন হাঁটতে পারবে না। অথচ জয় রোজ রাতে সবার চোখের আড়ালে কোথায় বেড়িয়ে যেত কেউ জানত না! এমন কি তুমিও তা সমাধান

করতে পারোনি। আমি জয়ের কাছে প্রকাশের কাকার পরিচয়ে গিয়েছিলাম। প্রকাশও আমার ছাত্র, তাই অসুবিধা হয়নি ছদ্মবেশের আশ্রয় নিতে। জয়ের সাথে প্রথম আলাপে স্বাভাবিক লাগলেও, ওর ঘরের পারিপার্শ্বিক পরিবেশটা মোটেও স্বাভাবিক ছিলনা। কিছু ছবি ছিল যা প্রায় অসম্পূর্ণ। কিন্তু ছবিগুলো এক সূত্রে বাঁধলে নৃশংস অমানবিক কর্মের দিক নির্দেশ করে। আর একটা ছবি প্রায় আবছা ছিল, যেন তা কারোর মুখাবয়বের সন্ধান করছে। জয়ের বিপরীতে একটি কাঁচের আয়না ছিল, যেটির মধ্যে একটি ছায়া ছিল।"

"আমরা যখন আজ জয়ের কাছে আসি, দেখি জয় নেই। আর ঘরে যে ছবিটা আবছা আঁকা ছিল সেটা পরিষ্কার ভাবে আঁকা। সেই ছবিতে ফুটে উঠেছে মহেশের মুখ। তখনই আমরা মহেশের বাড়ি যাই। তারপর বাকিটা তুমি জানো। তবে ব্যাপারটা এখানে শেষ নয়। দীনু, কাল পুলিশ রিপোর্টে জানতে পেরেছিল তাঁর মেয়ে নিশা আর নেই। তাঁর এই মেয়ে নিশার ছবি আমি দেখেছিলাম আগেই। তারই একটা আঁকা ছবি আমি জয়ের ঘরেও দেখতে পেয়েছিলাম। শুধু জানি না জয়ের সাথে নিশার এই যোগসূত্রটা কি?"

তাহলে জয় হাঁটত! — বিস্ময়ের সাথে রঞ্জনা প্রশ্ন করল। ...ক্রমশ ■

গুঞ্জন পড়ুন ~ গুঞ্জন পড়ান

মেবার ভ্রমণ

চিতোর পর্ব (৩য় ভাগ)

মালা মুখার্জী

অরুণাস্তে অন্ধকার নামতেই লাল আলো ছড়িয়ে পড়ল কুম্ভপ্যালেসের ধ্বংসস্তুপের ওপর – আর জলদ গম্ভীর কণ্ঠে কোনো অদৃশ্য কথাকার বলতে শুরু করলেন চিতোরগড়ের কথা। এই চিতোরগড় চিত্রাঙ্গদ মৌর্য্যের তৈরী, যিনি মৌর্য্য বংশের উত্তরাধিকারী ছিলেন। বাপ্পা রাওয়াল সপ্তম শতকে (৭২৪/ ৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে) এর অধিকার পান ও তখন থেকেই গোহেলা বংশের রাজত্ব শুরু। লালও লাল থেকে গেরুয়া হল, ক্রমে সোনালী চিতোরে সূর্য্য উঠল, একের পর এক রাজার বীরগাথা, রাণীরাও কম নন।

সঞ্জয়লীলা ভানশালীর বিতর্কিত পদ্মাবতী ফিল্ম, যা কিনা মালিক মহম্মদ জয়সীর (১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত সম্ভবত) রচনার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, তা আজ আবালবৃদ্ধবনিতার জ্ঞাত। তেরোশ শতকে রাণা রতন সিং সিংহলবাসিনী পদ্মাবতীকে রাণী করে আনেন ও রাণীর কিংবদন্তী রূপের কথা শুনে দিল্লির বাদশা আলাউদ্দিন খিলজী

চিতোর আক্রমণ করে তাকে শশ্মানে পরিণত করেন। জ্বলে ওঠে পদ্মাবতী ও অন্য রাণীদের জীবন্ত চিতা বা জহর, যাকে কেন্দ্র করে যুগে যুগে সতীদাহর মতো ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর প্রথা মহিমান্বিত হয়েছে।

তবে ইতিহাস কিছু অন্য কথা বলে। পদ্মিনী ছিলেন রাণা লক্ষ্মণ সিংয়ের কাকিমা, রাণা নাবালক হওয়ায় তাঁর কাকা ভীমসিংই রাজত্ব চালাতেন। পদ্মাবতীর স্বামীর নাম ভীম সিংহ, এমন উল্লেখ বঙ্কিমচন্দ্রের রাজকাহিনীতেও আছে। রাণী চৌহানবংশের রাজকন্যা ছিলেন। এ প্রসঙ্গে আমি আবার টডসাহেবের বইয়ের নাম নেব আর তার সঙ্গে বলব শ্রীপারাবতের লেখা *মেবারবহ্নি পদ্মিনী* পড়তে, যদিও বইটা সহজলভ্য নয়। সরাসরি রাণী না হলেও যৌথপরিবার কখনোই কূলবধূর অপমান সহ্য করেনি, রাজপুতবীরেরা আমৃত্যু যুদ্ধ বা সাকা করে জীবন বিসর্জন দেওয়ার সাথে সাথে নারীরাও জহর কুণ্ডে ঝাঁপ দেন। কবির কাব্যে লেখা হয় love, lust এবং dedication এর এক ভয়ঙ্কর অধ্যায়, যা ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। লাল রক্তিম শিখা আর করুণ সুরে বেজে ওঠা সানাইয়ের শব্দ ঘোষণা করে চিতোরের প্রথম রাজবংশের পতন।

এরপর আবার চিতোরের কেল্লায় লাগে সোনালী সূর্য্যের রং, কিন্তু এবার তা শিশোদিয়াদের হাত ধরে। সূর্য্যবংশীয় বীর রাণা হামিরদেব (১২৮০-১৩০১) জালালউদ্দিন খিলজী ও আলাউদ্দিন

খিলজীকে প্রতিহত করে রাজপুত কনফেডারিসি গড়ে তোলেন। ভগবান একলিঙ্গ শিবের একান্ত ভক্ত ও দেওয়ান প্রতিষ্ঠা করেন বর্তমান রাজবংশের। রাণা কুম্ভ, রাণা সঙ্ঘের মতো বীরেদের মহিমার পাশাপাশি রাণী মীরা ও কর্ণাবতীর কাহিনীও ইতিহাস প্রসিদ্ধ । রাণা কুম্ভের সামরিক বিজয় ও বিজয় স্তম্ভের কথা নিশ্চয় পাঠকগণ ভোলেননি, তবে এনার আর একটি কীর্তির কথাও সবিস্তারে বলব, তা হল কুম্ভলগড় দুর্গ ও কুম্ভশ্যাম মন্দির, তবে সেটা এখানে নয়, অন্য পর্বে।

চিত্র পরিচয়ঃ সতীস্থল – এখানেই জ্বলেছিল রাণী পদ্মিনীর জহরের আগুন...

শাক্ত রাজাদের এই কুম্ভশ্যাম মন্দির পরবর্তীকালে হয়ে ওঠে ভক্তি আন্দোলনের কেন্দ্র, আর তা হয় তাঁর প্রপৌত্রবধূ

মীরাবাঈয়ের হাত ধরে। যুদ্ধের কাড়ানাকাড়া আর জহরের আগুনকে সরিয়ে দিয়ে কুম্ভশ্যাম মন্দিরে বেজে উঠল মীরার সুর, *'মীরাকে প্রভু গিরধর গোপালা, অউর দুজা না কঈ';* রাজবধূর সন্ন্যাসিনী হওয়ার লড়াই... শ্রী রাধার মতোই কলঙ্ক নিয়ে তিনি ঘর ছেড়ে চললেন দ্বারকায় দ্বারকাধীশের আশ্রয়ে, আর শুরু হল চিতোরের পতনের আর এক অধ্যায়।

মীরার স্বামী রাজা ভোজ অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু বরণ করলে তাঁর ভ্রাতা বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে বসেন, কিন্তু তাঁরও মৃত্যু হলে রাণা সঙ্ঘের রাণী অর্থাৎ রাজা ভোজের মা কর্ণাবতী দুই নাবালক পুত্রের নামে সিংহাসনের গুরুদায়িত্ব নেন। ইতিমধ্যে রাজপরিবারের অন্তর্কলহ এমন বিকট রূপ নেয় যে গুজরাটের শাসক বাহদুর শাহ পুনরায় চিতোর আক্রমণ করেন। রাণী কর্ণাবতী এমত অবস্থায় এক অত্যন্ত দূরদর্শিতার কাজ করেন। তিনি মুঘল সম্রাট হুমায়ুনকে রাখী পাঠিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করেন।

দুই যুযুধান জাতিকে মেলানোর এই অভিনব প্রচেষ্টা কোনো পক্ষের রাজপুরুষরাই ভাল চোখে দেখেনি। হুমায়ুন তখন বাংলায় লড়ছিলেন আফগানদের বিরুদ্ধে। কর্ণাবতীর রাখী পৌঁছতে দেরী হয়, পাত্রমিত্ররা বারম্বার বারণ করেন স্বজাতীয় বাহদুরশাহের বিরুদ্ধে না যেতে, তথাপি হুমায়ুন এসেছিলেন বোনের মান রাখতে, কিন্তু হায় বড় দেরী হয়ে গেছে যে। কর্ণাবতী পারেননি চিতোরকে বাঁচাতে, পুনরায়

জ্বালিয়েছেন জহরের চিতা। তবে... তবে হ্যাঁ রাণী কর্ণাবতী চিতোরকে না বাঁচাতে পারলেও দাই পান্না বাঁচাতে পেরেছেন শিশু যুবরাজ উদয় সিংকে, আর তার জন্য শত্রুর নিশানা বানিয়েছেন নিজের শিশুপুত্রকে। মন ভার করে দেয় ধাত্রী পান্নার কাহিনী। অবশেষে উদয় সিং বুঁদিতে আশ্রয় পান ও পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠা করেন উদয়পুরের, যেখানে লেখা হয় মেবারের আর এক বীর গাথা। (সেগুলি শোনা যাবে কুম্ভলগড় আর উদয়পুরের ‘লাইট অ্যাণ্ড সাউণ্ড’এ।)

চিত্র পরিচয়ঃ চিতোরগড়ের লাইট অ্যাণ্ড সাউণ্ড...

ফ্লাশলাইটের আলো জ্বলে ওঠার সাথে সাথে ফিরে এলাম বর্তমান যুগে। বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া, গায়ে হাতে ব্যথা অনুভব করলাম। আমরা বেরনোর আগেই হুড়হুড় করে আর একদল

পর্যটক এসে ঢুকল সেকেণ্ড শো দেখার জন্য, চলতে লাগল সিট দখলের লড়াই। অটোওয়ালা অপেক্ষা করছিল, আমরা উঠতেই অন্ধকার পাকদণ্ডী বেয়ে নামতে থাকে অটো, মন ভারাক্রান্ত এত মৃত্যু আর আত্মত্যাগের কাহিনীতে, তারই মধ্যে যেন কোথার থেকে ভেসে আসছে ভজনের সুর। আকাশের দিকে তাকালাম, এমন পরিস্কার কালো আকাশেই কি মীরা খুঁজে পেতেন তাঁর কৃষ্ণ গিরধারীকে? ... ক্রমশ ■

বিশেষ ঘোষণা

গুঞ্জনে প্রতি মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্তই পরের (মাসের) সংখ্যার জন্য লেখা গ্রহণ করা হয়।

বীণাপাণি

সুভাষ মুখার্জী (নীলকন্ঠ)

॥৩॥

দেবীর জন্ম ইত্যাদির ক্ষেত্রেও হিন্দু ধর্মের সেই সনাতন বিড়ম্বনা; মতাধিক্য! সঠিক যুক্তিগ্রাহ্য বর্ণনার জন্য বিভিন্ন পুরাণের তথ্যের সঠিক সংমিশ্রণ আবশ্যক। দেবী সরস্বতীর জন্মের তত্ব মোটামুটি দুটি; হয় তিনি ব্রহ্মার শরীর থেকে বেরিয়েছেন কারন এঁদের দুজনেরই জ্ঞানের সাথে সম্পর্ক রয়েছে অথবা তিনি আদি স্ত্রী শক্তি থেকেই উৎপন্ন হয়েছেন। বাকি সব পুরাণ সাধারণতঃ নিজের কেন্দ্রীয় চরিত্রকে শ্রেষ্ঠ দেখাতে গিয়ে তাঁকেই সকলের জন্মদাতা(দাত্রী) বলে দাবি করে। এখন এরকমটাও হতে পারে যে আদ্যাশক্তির অংশেরা যেমন চিরস্থায়ী হন না সেরকমই মহাসরস্বতী রূপে তাঁর প্রকাশ হলেও তিনি স্থায়ী অবতার নেন বাগ্দেবী রূপে।

ব্রহ্মার আপন বীজ সঞ্চয় করে রাখার গল্পটা একটু অযৌক্তিক। কারন তিনি ত্রিদেবের একজন; অনেক পরে রামায়ণ মহাভারতের যুগেও যখন অধিকাংশ ঋষির বীজ অব্যর্থ ছিল (যা নির্গত হলে সাথে সাথেই সন্তান সৃষ্টি হতো)

(*** শেষে দেওয়া "ঘটনা সূত্র" পড়ে নিলে ঘটনাবলী এবং তাদের তুলনায় সুবিধা হবে)

তখন স্বয়ং ব্রহ্মার বীজ সঞ্চয় করে রাখা কি করে সম্ভব? আবার উর্বশীর ক্ষেত্রে সেভাবেই সঞ্চিত বীজ সাথেসাথেই সরস্বতী(বা অগস্ত্য)র জন্ম দিল! যুক্তিতে মেলে না। অন্যদিকে যে অর্থে ব্রহ্মার দেহ উদ্ভূতা বলে সরস্বতী তাঁর কন্যা সেই অর্থে কোথাও কোথাও লক্ষ্মীর বিষ্ণুর কন্যা বলা যায়। তাই অর্থ অনুসারে ব্রহ্মাকে "আপন কন্যাতে আসক্ত" বলে চেঁচিয়ে লাভ নেই। শুধু এই কারনে মহাদেব তাঁরই মতো ত্রিমূর্তির আরেক অংশকে মস্তকচ্যুত অথবা শাপিত করবেন এটাও সহজে মানা যাচ্ছে না। তবে তাঁর কন্যাসক্তির ঘটনাটা ঘটেছে ঠিকই। কিন্তু তা অন্য ক্ষেত্রে। মাথা কাটা যাওয়ার ঘটনাও অন্য সময়ে।

প্রারম্ভিক সৃষ্টির কাজ শুরু করে নিজের ক্ষমতা দেখে ব্রহ্মা অহঙ্কারী হয়ে ওঠেন। শিব তাঁকে অনেক বোঝালেও তিনি মহাদেবকে অপমান করতে শুরু করেন। মহাদেব তাঁর পঞ্চম মুখটি ত্রিশূলে কেটে বাদ দিয়ে দেন। তার কারন কিন্তু রাগ নয়। মহাদেব বোঝান যে প্রত্যেক শরীর শুভ আর অশুভের আধার। ব্রহ্মার শরীরে ওই মুখটিই ছিল তাঁর অশুভের (অহঙ্কারের) প্রতীক। ত্রিদেবের শরীরে অশুভের স্থান থাকতে পারে না, তাই ত্রিশূলকে তার কাজ করতে হল। মাথা কাটা যেতেই ব্রহ্মা ভুল বুঝতে পারেন এবং শিবকে নিজের আরাধ্যও করে নেন। এই ঘটনা বা শিবের এই ব্যাখ্যা বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত। কাজেই শিবের ঘটনায়

পক্ষপাতিত্ত্বের অভিযোগ চলে না। একই ব্যাখ্যা গনেশের মাথা কাটা যাওয়ার ঘটনাতেও দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে অবশ্য প্রথম পূজ্য হিসাবে গনপতিকে অশুভ-রোহিত হতে হতো। ত্রিশূলের এটাও একটা তাৎপর্য। ব্রহ্মার অভিশাপের ঘটনাতে পরে আসছি।

সরস্বতীর সামাজিক পরিচয়েও দুটি মত যুক্তিযুক্ত: তিনি শুরু থেকেই ব্রহ্মার পত্নী অথবা প্রথমে বিষ্ণুপত্নী পরে ব্রহ্মাণী। শাপের তীব্রতা প্রশমনের জন্য তিনি ব্রহ্মাণী হতে পারেন কিন্ত তাঁর এক অংশ শাপ ভোগ করছে আরেক অংশ ব্রহ্মার ঘর করছে এটাও ঠিক মেলে না। তিনি যদি নারায়ণের স্ত্রী হয়েও থাকেন তবে অতি বিদ্যাবত্তার কারনে তিনি (বিষ্ণুর গ্রহনযোগ্যা হন নি এমনও হতে পারে) ব্রহ্মার জন্যই উপযুক্ত এই হিসাবে ব্রহ্মাণীতে রূপান্তরিত হন। পরে কখনও বৈকুণ্ঠে গেলে লক্ষ্মীকে দেখে ঈর্ষা বশতঃ ঝগড়ায় জড়িয়ে শাপিত হন। সেইমতো পৃথিবীতে সরস্বতী নদী রূপে থাকলেও ভগীরথের জন্য গঙ্গা (শিব পার্বতীর মাঝে আসবেন না বলে ইন্দ্রের ডাকে স্বর্গে গিয়েছিলেন) স্বর্গ থেকে ফিরলে ব্যক্তিত্ত্বে হেরে তাঁকে পাতালে যেতে হয়। বর্তমান কালে গঙ্গার তলায় সরস্বতী নদীর অবস্থান করাও হয়তো এই হেরে যাওয়ার প্রতীক।

তিনি প্রথম থেকেই ব্রহ্মার পত্নী থাকুন অথবা পরেই তাঁর স্ত্রী হোন তাঁদের মিলনে স্বয়ম্ভূ মনু এবং শতরূপা

নামের দুঠি ছেলে মেয়ে হয়। এই শতরূপার কারনেই সরস্বতী ব্রহ্মাকে অভিশাপ দেন এবং তাঁকে ছেড়ে নদী হয়ে পাতালে চলে যান। এই অভিশাপ বা বিচ্ছেদ একধরনের দাম্পত্য কলহ যার যথেষ্ট কারন এবং পূর্ণ অধিকার স্ত্রীর ছিল। ব্রহ্মার শতরূপা (গ্রন্থভেদে ভিন্ন নাম) বিষয়ে ব্যবহারে রজঃগুনের প্রভাব আছে। শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "দেবতায় মনুষ্যেত্ত্ব আরোপ"এর ব্যাপারটি সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর পর আমার আর এই বিষয়ে হাত দেওয়ার সাহস নেই।

দেবাদিদেব একবার ব্যাখ্যা করেছিলেন যে নারায়ণ সত্ত্বগুন, ব্রহ্মা রজঃগুন আর তিনি নিজে তমঃগুনের প্রতীক। সত্ত্বগুন হল প্রকৃতি, রজঃগুন অহংকার সহ সমস্ত বদগুন এবং তমগুন হল অন্ধকার। রজঃগুন থেকে সত্ত্বগুনের জন্ম তাই ব্রহ্মা বিষ্ণুর আরাধ্য। সত্ত্বগুন থেকে তমঃগুনের জন্ম তাই নারায়ণ শিবের আরাধ্য। আর তমঃগুন থেকে রজঃগুনের উৎপত্তি তাই মহাদেব ব্রহ্মার আরাধ্য। তিনি আরও সহজ করে বোঝান যে জীব প্রতিপালন করতে গেলে তাদের জন্ম সম্পর্কে জ্ঞান প্রয়োজন তাই পালনকর্তা সৃষ্টিকর্তার ধ্যান করেন। কাউকে ধ্বংস করতে গেলে তার জীবনযাপন সম্পর্কে জ্ঞান প্রয়োজন তাই ধ্বংসকর্তা পালনকর্তার ধ্যান করেন। আবার নতুন সৃষ্টির জন্য পুরাতনের বিনাশের জ্ঞান প্রয়োজন তাই সৃষ্টিকর্তা

সংহারকর্তার ধ্যান করেন। পরে ব্রহ্মা নিজের তীর্থ স্থাপনে এবং নিজের স্ত্রী'র মানভঞ্জনে উদ্যোগী হলে পুষ্কর তীর্থ তৈরী হয়। দুজনের কথাই রইলো।

ব্যক্তিগত জীবনধারা বা চরিত্র নয়; শিল্পীর পরিচয় যেমন তাঁর গুনের দ্বারা নির্ধারিত হয়, শিক্ষকের মান যেমন তাঁর দেওয়া শিক্ষা বা জ্ঞানের দ্বারা নির্ধারিত হয় তেমনই বীণাপাণি বাগদেবী তাঁর নিরন্তর প্রসারিত জ্ঞানের জন্যই জ্ঞানভিক্ষুদের আরাধ্যা হয়ে থাকবেন।

ওঁ তরুণশকলমিন্দোর্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ কুচভরনমিতাঙ্গী সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে। নিজকরকমলোদ্যল্লেখনীপুস্তকশ্রীঃ সকলবিভবসিদ্ধৈ পাতু বাগ্দেবতা ন।

চন্দ্রের নূতন কলাধারিণী, শুভ্রকান্তি, 'কুচভরনমিতাঙ্গী', শ্বেত পদ্মাসনে আসীনা, হস্তে লেখনী-পুস্তক শোভমানা বাগ্দেবী; সকল বিভবপ্রাপ্তির জন্য আমাদের সিদ্ধি দান করুন

॥ঘটনা সূত্র॥

ঋগ্বেদ:

দেবী সরস্বতীকে ইলা এবং ভারতী নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই মন্ত্রে ইলা, সরস্বতী, ভারতীকে অগ্নির ত্রিমূর্তি হিসাবে বন্দনা করা হয়েছে। "শুচির্দেবেষ্বপিতা হোত্রা মরুৎসু ভারতী। ইলা সরস্বতী মহী বর্হিঃ সীদন্তু যজ্ঞিয়াঃ।" ভারতী স্বর্গস্থ বাক্দেবতা, ইলা পৃথিবীস্থ বাক্দেবতা এবং সরস্বতী অন্তরীক্ষস্থ বাক্দেবতা। (সূক্ত১৪২ মন্ত্র ৯)

যজুর্বেদ:

একসময় ইন্দ্রের শরীরের শক্তি চলে যাওয়ার ফলে তিনি মেষ আকৃতি গ্রহণ করেন। সেসময় ইন্দ্রের চিকিৎসার দায়িত্ব ছিল স্বর্গের অশ্বিনীদ্বয়ের উপর এবং সেবা-শুশ্রুষার ভার ছিল সরস্বতীর হাতে। সংগীত ও নৃত্যপ্রেমী ইন্দ্র সরস্বতীর গানবাজনা ও সেবায় সুস্থ হওয়ার পর তাকে মেষটি দান করেন।

সনাতন ধর্ম:

ঈশ্বর এক, অদ্বিতীয়, নিরাকার এবং সর্ব্ব্যাপি। ব্রহ্মা হল সেই ঈশ্বরের আরেক নাম। সরস্বতী হল ব্রহ্মার মুখ নিঃসৃত 'বাক' তার জন্য সরস্বতী 'বাগদেবী' হিসাবে পরিচিত। এই ব্রহ্মার মুখ নিঃসৃত 'বাক' হল বেদসমূহ এবং সরস্বতী হলেন বেদমাতা গায়ত্রী। গায়ত্রী শব্দ উৎপন্ন হয়েছে সংস্কৃত 'গায়ত্রা' থেকে যার অর্থ ছন্দ বা মন্ত্র, এই গায়ত্রী হল বেদমন্ত্রের একক অর্থাৎ জননী।

ভাগবত পুরাণ:

ব্রহ্মার কন্যা সরস্বতী (ব্রহ্মার মুখ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছিলেন তাই ব্রহ্মার কন্যা) মনোহারিণী সুন্দরী ছিলেন। নিজ কন্যাকে দেখে ব্রহ্মা কামগ্রস্থ হয়েছিলেন যদিও সরস্বতী নিজে কামভাব রহিতা ছিলেন। পিতাকে এই রকম কুকর্মে আসক্ত দেখে পুত্র মরীচি প্রভৃতি মুনিগণ তাঁকে বোঝান যে তাঁর পূর্ববর্তী কোনো ব্রহ্মাই (শ্রেষ্ট ব্যক্তি) এমন

কাজ অতীতে করেননি। তাঁর মতো তেজস্বী পুরুষের এই কাজ শোভন নয়; কারণ তাঁর মতো ব্যাক্তিদের চরিত্রের অনুসরণের দ্বারাই সংসারের মঙ্গল হয়ে থাকে। প্রজাপিতা ব্রহ্মা এতে অত্যন্ত লজ্জিত হলেন এবং ব্রীড়াবশত তাদের সামনেই নিজদেহ পরিত্যাগ করলেন। তখন ব্রহ্মার পরিত্যক্ত সেই শরীরটি দিকসকল গ্রহণ করল এবং সেটিই কুয়াশা বা অন্ধকারে পরিণত হল।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ:

মা চণ্ডী শুম্ভ নিশুম্ভকে বধ করার সময় মহাসরস্বতী দেবীর অষ্টভুজা মূর্তি ধরেছিলেন। তিনি 'একৈবাহং জগত্যত্রঅঃ দ্বিতীয়াকা মমাপরা' বলে মোহদুষ্ট শুম্ভকে অদ্বৈত জ্ঞান দান করেছিলেন।

দেবী (ভাগবত) পুরাণ:

আদ্যাশক্তি দুর্গার শরীর থেকে জন্ম হয় কৌশিকী দেবীর তিনিই সরস্বতী। ব্রহ্মা প্রথম তাঁকে পূজা করেন। পরে জগতে মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে কৃষ্ণ তাঁর পূজা প্রবর্তন করেন। গঙ্গা ও লক্ষ্মীর সাথে সরস্বতী ছিলেন নারায়ণের পত্নী। একবার নারায়ণের অধিকার নিয়ে লক্ষ্মীর সাথে সরস্বতীর তুমুল বিবাদ উপস্থিত হয়, গঙ্গা লক্ষ্মীদেবীর পক্ষ নেন। এই বিবাদের পরিণামে সবাই একে অপরকে অভিশাপ দেন। সরস্বতীর অভিশাপে মা লক্ষ্মী অসুর শঙ্খচূড়ের পত্নী ও পরে তুলসীগাছের জীবনধারন করেন।

গঙ্গার অভিশাপে সরস্বতী নদীতে পরিণত হন। সরস্বতীও গঙ্গাকে নদীতে পরিণত হবার অভিশাপ দেন। পরে নারায়ণ বিধান দেন যে, সরস্বতী এক অংশে নদী, এক অংশে ব্রহ্মার পত্নী ও এক অংশে তাঁর সঙ্গিনী হবেন এবং কলিযুগের পাঁচ হাজার বছর অতিক্রান্ত হলে সরস্বতী সহ তিন দেবীরই শাপমোচন হবে।

স্কন্দপুরাণ:

ব্রহ্মা তাঁর পত্নী গায়ত্রী কন্যা সরস্বতীর প্রতি দুর্ব্যবহার করলে শিব তাঁকে শরবিদ্ধ করে হত্যা করেন। তখন গায়ত্রী, সরস্বতীকে নিয়ে স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনার জন্য গন্ধমাদন পর্বতে তপস্যা শুরু করেন। তাঁদের দীর্ঘ তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে শিব ব্রহ্মার প্রাণ ফিরিয়ে দেন। গায়ত্রী ও সরস্বতীর তপস্যাস্থলে দুটি প্রসিদ্ধ তীর্থ সৃষ্টি হয়। জগতে শুধু ব্রহ্মার তীর্থ নেই এই ভেবে ব্রহ্মা পৃথিবীতে নিজের তীর্থ স্থাপনে একটি সর্বরত্নময়ী শিলা পৃথিবীতে নিক্ষেপ করেন। সেটি চমৎকারপুরে এসে পড়ল। ব্রহ্মা সেখানেই নিজের তীর্থ স্থাপন করবেন বলে সরস্বতীকে পাতাল থেকে ডেকে তুলে বললেন, "আমি এখন থেকে তোমার জলে ত্রিসন্ধ্যা তর্পণ করব।" সরস্বতী বললেন তিনি লোকের স্পর্শ ভয় পান তাই সব সময় পাতালে থাকেন; তখন ব্রহ্মা সরস্বতীর অবস্থানের জন্য একটি হ্রদ তৈরী করে ভয়ংকর সাপেদের সেই হ্রদ ও সরস্বতীর রক্ষার দায়িত্ব দেন। সেটিই পুষ্কর তীর্থ। ...ক্রমশ ■
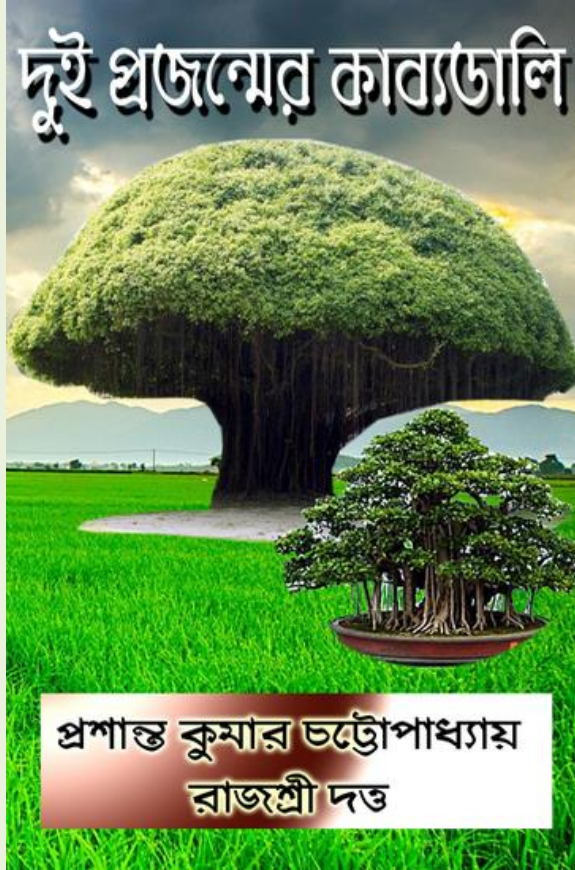
দুই প্রজন্মের দর্শনের ওপর ভিত্তি করে, বর্তমানের কিছু চিত্র শুধু ভাষার মাধ্যমে একত্রে উপস্থাপন করেছেন দুই প্রজন্মের দুই কবি। আধুনিক কবিতা প্রেমীদের জন্য একটি অসামান্য কবিতা সংগ্রহ।

র
হ
স্য
পিয়ালী চ্যাটার্জী মল্লিক
অনির্বাণ বিশ্বাস
নাহার আলম
স্বাগতা পাঠক

প্রতিশোধ

হাতছানি

পিয়ালী চ্যাটার্জী মল্লিক

ড্রেসিং টেবিলের সামনে রাখা চেয়ারে বসে চন্দ্রিমা চিরুনি তুলে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে নিজের সৌন্দর্যের দিকে চেয়ে মনে মনে বলে উঠল, "সত্যি এমন রূপে সবাই মুগ্ধ হতে বাধ্য।" গুনগুন করে সে গেয়ে উঠল একটি গান। নিজের দিকে চেয়ে চুল আচড়াচ্ছে... হঠাৎ আয়নায় নিজের ঠিক পিছনে একটি কালো ছায়া দেখে আঁতকে ওঠায় তার হাত থেকে চিরুনি ছিটকে গেল।

"কে? কে ওখানে?" একটু একটু করে এগিয়ে গিয়ে চন্দ্রিমা সব দরজা জানালা দেখে নিল। না, সব দরজাই তো বন্ধ – মনে পড়ল রাজবীর অফিসে বেরিয়ে যাওয়ার পর সে নিজের হাতে তালা বন্ধ করেছে ভিতর থেকে। তবে কি মনের ভুল? তাই হবে। দু'হাত দিয়ে চুল মাথার পিছনে টেনে একটি ক্লিপ দিয়ে আটকে নিয়ে, রান্নাঘরে ঢুকে সে কয়েকটি সব্জি নিয়ে ছুরি দিয়ে কাটতে লাগল। চপিং বোর্ডের উপর ছুরির আঘাতের খট খট শব্দ ভাসতে লাগল সারা বাড়িটাতে। চন্দ্রিমার মনে হচ্ছিল ওর পিছনে কেউ আছে। সে পিছন ফিরতেই কলিং বেলটা বেজে উঠল।

প্রতিশোধ

দরজা খুলে সে দেখল রাজবীর ফিরেছে। "কি গো এত দেরি হল দরজা খুলতে?" রাজবীর বিরক্তি নিয়ে চন্দ্রিমাকে জিজ্ঞেস করল। চন্দ্রিমা উত্তর না দিয়েই রান্না ঘরে ঢুকে গেল। রাজবীর জামা কাপড় বদলাচ্ছে এমন সময় এক গ্লাস শরবত নিয়ে ঘরে ঢুকলো চন্দ্রিমা। "নাও এটা খেয়ে নাও," শরবতের গ্লাসটা রাজবীরের দিকে এগিয়ে দিল চন্দ্রিমা।

"বাবা হঠাৎ আজকে শরবত আনলে? এক সপ্তাহ হল বিয়ে হয়েছে, আজ কি এমন হল যে শরবত বানিয়ে আনলে?" সরবতের গ্লাসএ পর পর ঢোক ঢোক করে কয়েকটা চুমুক দিয়ে থামল রাজবীর।

চন্দ্রিমা আবার রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। রাজবীর মোবাইল আর ল্যাপটপ নিয়ে বিছানায় উঠে বসল। ল্যাপটপে দু'বছর আগের একটি ভিডিও চালাতে যাবে, এমন সময় তার মাথাটা ঘুরে উঠল। রাজবীর দু'হাত দিয়ে মাথাটা চেপে ধরল, কিন্তু তাতে কিছুই বদলালনা - বরং আরো অস্বাভাবিকভাবে মাথার ব্যাথাটা বেড়ে গেল। রাজবীর নেতিয়ে পড়ল বিছানায়। অনেক করে চেষ্টা করেও চন্দ্রিমাকে সে ডাকতে পারলনা। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তার মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরতে লাগল। ওঠার অনেক চেষ্টা করেও যখন নড়তে পারলনা, ঠিক তখনই সে দেখল তার সামনে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। চন্দ্রিমাই তো!

কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে কেন চন্দ্রিমা? তাহলে কি ওই শরবতে কিছু মেশাল? কিন্তু কেন? সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে রাজবীর খেয়াল করল কোথাও একটা কাঁচ ভাঙার আওয়াজ হচ্ছে। একটু চোখ ফেরাতেই সে দেখল পাশে রাখা ল্যাপটপ এর স্ক্রিনে অদ্ভুতভাবে ফাটল ধরছে এবং কাঁচগুলো বেরিয়ে আসছে তার দিকে। রাজবীর হাতড়ে বিছানা দিয়ে নামতে চেয়েও পারছে না। দূরে দাঁড়িয়ে সেই নারীমূর্তি হাসছে। খিলখিলানো সেই হাসি শুনে রাজবীরের মাথা আরো বেশি ঘুরছে।

"কি কষ্ট হচ্ছে বুঝি রাজ?"

"কে? কে তুমি? চন্দ্রিমা..."

"চিনতে পারছনা আমায় রাজ? আমি তোমার নীরা। আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।"

"নীরা? না। তুমি মিথ্যে বলছ। চন্দ্রিমা... চন্দ্রিমা..."

"কেউ আসবে না রাজ। চন্দ্রিমাকে একটু আগেই আমি অন্য এক দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিয়েছি। তোমার বেলএর শব্দে যেভাবে ও দৌড়ে তোমার কাছে যাচ্ছিল... আমার খুব হিংসে হল জান? যেই ছুড়িটা দিয়ে ও সব্জি কাটছিল সেটা দিয়েই ওর গলার নলিটা কেটে দিলাম। একটু আগে ওর কাটা লেবু দিয়েই তো শরবত খেলে তুমি। ও কেন এলো রাজ আমাদের মাঝে? তুমি তো আমাকে ভালোবাসতে, বলো রাজ?"

প্রতিশোধ

“না না না না! আমি তোমায় কখনো ভালোবাসিনি নীরা। এক মুহূর্তের জন্যেও না। আমি শুধু তোমার অহংকারকে পিষে ফেলতে চেয়ে ছিলাম আমার পায়ের নীচে। আমি বুঝতে পারিনি এমনটা হয়ে যাবে। আমাকে ছেড়ে দাও নীরা।'

“ছেড়ে দেবো? না রাজ। তুমি তো আমাকে ছাড়োনি। আমিওতো কতবার বলেছিলাম আমাকে ছেড়ে দাও।”

“আমি ভুল করেছি, আমাকে ছেড়ে দাও নীরা।”

রাজবীর কথা শেষ করার আগেই ল্যাপটপ এর ভাঙা কাঁচের টুকরোগুলো ওর সারা শরীরে ঢুকে গেল। রাজবীর ব্যাথায় চিৎকার করে উঠল।

“আআআআ... নীরা আমাকে মেরনা। আমায় ছেড়ে দাও।”

অন্য দিকে আর কোনো শব্দ নেই। বাড়ির কোন কোনায় যেন কেউ নেই, কেউ যেন ছিলইনা কখনও। রাজবীর এর মনে পড়ে গেল দু'বছর আগের কথা...

দু’বছর আগে

রাজবীর তার বন্ধুর জন্মদিনের পার্টিতে যায় এবং সেখানে গিয়ে আলাপ হয় নীরার সাথে। নীরাকে দেখে রাজবীর খুব আকর্ষিত হয়ে পড়ে তার দিকে। পার্টিতে গান চলাকালীন রাজবীর নীরার সাথে নাচবার সুযোগ নিয়ে তার শরীরের বিভিন্ন জায়গা ছোঁয়ার চেষ্টা করে। নীরা সেটা বুঝতে পেরে সেই পার্টিতেই সকলের সামনে টেনে এক থাপ্পড় মারে রাজবীরকে। রাজবীর সেই থাপ্পড়ের বদলা

নিতে নীরার কাছে বারংবার ক্ষমা চায়। কিন্তু তার কোনো কথাই সেদিন নীরা শুনছিলনা। তাই শেষ পর্যন্ত সে টানা তিন দিন নীরার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। শীতের রাতে রাজবীরকে অমন করে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নীরার রাগ গলে যায়, এবং সেই সুযোগ নিয়ে রাজবীর নীরাকে প্রপোজ করে বসে।

তার জন্য জীবনে কেউ এত কষ্ট করেনি, এই ভেবে নীরা মন দিয়ে ফেলে রাজবীরকে। কিন্তু রাজবীরের মনে ছিল অন্য কিছু। সে একদিন নীরাকে নিজের বাড়িতে ডেকে তার সাথে নিজের একটি অন্তরঙ্গ ভিডিও রেকর্ড করে নীরাকে ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করে। নীরা জীবনে প্রথম কাউকে এতটা ভালোবেসে তার থেকে এমন বিশ্বাসঘাতকতা সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে।

এখন

নীরার মারা যাওয়ার পর ওর মৃত্যুকে ঘিরে অনেক জল ঘোলা হয়। নীরার বাড়ির আশেপাশের অনেকেই রাজবীরকে তার বাড়ি যেতে দেখেছিল, তারা সেটা পুলিশকে জানায়। তবে রাজবীরের ওপর মহলে পরিচয় থাকায় সে পরিষ্কার ভাবে ছাড় পেয়ে যায়। কোর্টে কেউ কিছু প্রমান করতে পারেনা তার বিরুদ্ধে। আজ টানা দু'বছরের পর নীরার কেসটা পুরোপুরি বন্ধ করা হয়েছে,

তাই আজ রাজবীর বাড়ি ফিরে নীরার ভিডিওটা অনলাইন আপলোড করবে বলে ভেবেছিল। ভিডিওটিতে শুধু নীরার মুখটাই বোঝা যাচ্ছে তাই তার কোনো চিন্তাও ছিল না সে বিষয়ে। অফিস থেকে ফিরে, তাই সে সোজা ল্যাপটপটা নিয়ে বসেছিল।

রাজবীরের সারা শরীর দিয়ে রক্ত বেরিয়ে যাচ্ছে। চোখে ঠিক মত দেখতে পাচ্ছে না সে, আস্তে আস্তে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে তার। কানের সামনে কার যেন একটা কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে দূর থেকে হাওয়ায়, "তুমি শুধু আমার রাজবীর, শুধুই আমার। এস আমার সাথে আমার দুনিয়ায় এস।"

শেষবারের মত চোখ বন্ধ করার আগে রাজবীর দেখল নীরা দু'হাত বাড়িয়ে রয়েছে তার দিকে। নীরার হাতের বড় বড় নখগুলি এগিয়ে আসছে তার গলার দিকে... ■

সনির্বন্ধ অনুরোধ

পাঠক পাঠিকাদের সহযোগিতায় আমরা গুঞ্জনের দশম সংখ্যা প্রকাশ করছি। তাই আপনাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু শুধু পড়লেইতো চলবেনা, গুঞ্জনেকে আপনার মনের মত করে সাজাতে হলে, আপনার মতামত আমাদের দফতর পর্যন্ত পৌঁছানো একান্ত জরুরি। সুতরাং আপনার মূল্যবান মন্তব্যগুলি লিখে আমাদের ই-মেলএ পাঠিয়ে দিন।

আমাদের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

দেওয়ালি

অনির্বাণ বিশ্বাস

আজকে ঈশার খুব আনন্দের দিন। আজ যে দেওয়ালি। চারিদিকে আলোর রোশনাই আর বাজির শব্দ। এখানে ভালোই বাজি ফাটে। মাঝেমধ্যে এমন জোরে ফাটে যে, একেবারে কান পাতা দায়। সেলগুলো ফেটে সারা আকাশ যখন আলোয় আলোকিত হয়ে যায়, তখন ঈশার দারুণ লাগে। সে তার ছোটো ছোটো হাতে তালি দিতে থাকে। তার মায়াপিসীর সঙ্গে ছাদে উঠে সে এসব দেখে। মায়াপিসী তাকে সেই ছোট্টবেলা থেকে তার স্নেহের অপরূপ বাঁধনে বেঁধে রেখেছে। তার সুখ-দুঃখ, আদর-আবদার সবই তার কাছে।

আসলে ছোটবেলা থেকে সে তার বাবা ও মা-কে ঠিক সেভাবে পায়নি। তারা দুজনেই হাই প্রোফাইল মানুষ। সমাজের তাদের কাছে বা সমাজের প্রতি তাদের যথেষ্ঠ দায়বদ্ধতা আছে। ফলস্বরূপ তাদের সারাদিন ঈশা কেন, নিজেদের খাবার বা ঘুমোবার সময়ও কম। যান্ত্রিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত হতে হতে তাঁরা কিছুটা হয়তো যান্ত্রিক হয়ে পড়েছেন। আসলে খুব বেশি ভাবাবেগ থাকলে সেটা কেরিয়ারে যথেষ্ঠ প্রভাব ফেলে। সেটা কম্প্রোমাইজ করা

তাঁদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। সে যাই হোক, আমি তাঁদের ব্যক্তিগত ঠিক বা ভুলের বিচার করতে বসিনি। আমার সে অধিকারও নেই। আবার গল্পে ফিরে আসা যাক।

ঈশার, তার অন্য বন্ধুদের মতো বাবা-মার সঙ্গে একসঙ্গে বাজি পোড়ানো বা ভাল করে দেওয়ালি সেলিব্রেশানের সুযোগ ও সৌভাগ্য কোনোদিনই হয়নি। সেটা তার বড় দুঃখের জায়গা। সে এখন একটু বড় হয়েছে। তাই একটু-আধটু প্রতিবাদ না হোক বায়না, ঝামেলা করতে শিখেছে। তাতে তার বাবা-মা কিছুটা বাধ্য হয়েই তার সঙ্গে সময় কাটাতে বাধ্য হয়। দু'জনকে একসঙ্গে না হোক, একজনকে সে মাঝেমধ্যে কাছে পায়। এ ব্যপারে তাকে বুদ্ধি কিছুটা যে মায়াপিসী দেয় সেটা তার পেরেন্টরা জানলেও কিছু বলেন না। আসলে ঈশার আবদারের ফলে কিছুটা তাঁদেরও ওর শৈশবসঙ্গী হবার অনির্বচনীয় সুখ অনুভব করা হয়। সেটা সব বাবা-মার কাছেই বড় সুখকর মুহূর্ত। এর ফলে তাঁদেরও ব্যস্ত জীবনের ব্যক্তিগত মুহূর্তের পড়া চড়া কিছুটা যে জোয়ারের স্পর্শ পেয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

অন্যবার উইক ডেজে দেওয়ালী পড়ায় তার মা-বাবা ব্যস্ত থাকায় বিভিন্ন অজুহাতে তার অন্য বাচ্ছাদের মতো দেওয়ালী সেলিব্রেশন হয়না। কিন্তু এবারে রবিবার পড়ায় সে অজুহাত একেবারেই চলেনি। অগত্যা সে তার মা-বাবাকে বলেছে একসঙ্গে সেলিব্রেট করার জন্য। সকালে সে

মায়া

বাবার সঙ্গে বাজি বাজারে গিয়ে প্রচুর বাজি কিনেছে। তারপর মায়াপিসীকে নিয়ে ছাদে গিয়ে নতুন কেনা বাজিগুলো রোদে দিয়েছে। বাজিগুলো থেকে কিছু বাজি সে মায়াপিসীর নাতির জন্য দিয়েছে। আজকে মায়াপিসী অনেকদিন পর কাছেই তার বাড়ি যাবে। নাতি খুব বায়না ধরেছে তাকে আজকে বিকেলে আসতেই হবে। ঈশার বাবা-মা আজ থাকবেন, তাই সে দুপুর বেলাই বাড়ি চলে যাবে বলেছে। কাল তার মা-বাবার অফিস আছে, তাই সে যত রাতই হোক চলে আসবে বলেছে।

সন্ধ্যেবেলা সে আজ দারুণ সেজেছে। মায়ের কিছু গয়না গাটিও পরেছে। সাদা রঙের সুন্দর একটা ফ্রক পরে তাকে ঠিক পরীর মতোই লাগছে। কবে যে শেষ এভাবে মা-বাবাকে পাশে নিয়ে, একসঙ্গে বাজি পুড়িয়েছে দেওয়ালির দিনে, তা তার তো মনেই পড়েনা। তাই আজ আনন্দে মাটিতে যেন পা-ই পড়ছেনা।

"কি গো মায়াদির কাছে শুনলে না আজকে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে চোদ্দ প্রদীপ দেখাতে হয়? প্রদীপগুলো কিনে নিয়ে এসো? আমার মা-কেও দেখাতে দেখেছি। অন্যবার তো হয়না, এবারে অন্তত হোক। কি গো যাও না, তাড়াতাড়ি নিয়ে এস না..."- ঈশার মা বললেন।

ঈশার বাবা — "কি দরকার আবার নতুন করে এসব শুরু করার? এখন মেয়েটাকে নিয়ে বাজি পোড়াতে যাচ্ছি দেখছ..."

মায়া

ঈশার মা – "দশ মিনিট লাগবে। সামনেই মল, ওখানে পাওয়া যায় আমি জানি। কালকে এক ভদ্রমহিলাকে দেখেছিলাম কিনতে। আসলে তখন মনে হয়নি, যাও না তাড়াতাড়ি..."-

ঈশার বাবা – "পাগল নাকি! আমি একা যাবনা। তারপর বলবে এটা টিক হয়নি, ওটা হয়নি। না না তুমিও চলো।"

ঈশার মা – "ওকে একা রেখে একদম নয়। আজকে মায়াদিও নেই।"

ঈশার বাবা – "আরে দশ মিনিটের জন্য। মা, তুমি বড় হয়ে গেছনা, একটু একা থাকতে পারবে তো? আমরা এক্ষুণি চলে আসব। ঠিকাছে?"

ঈশা কনফিডেন্টলি বলল – "একদম ঠিক থাকব। তুমি চিন্তা করোনা।"

ঈশার মায়ের একটু আপত্তি থাকলেও ঈশার বাবার জোরাজুরিতে ওনারা বাইরে থেকে দরজায় তালা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় পাশের বাড়িতে বলেও গেলেন।

দোকানে কেনাকাটা করার পর বিলিং এর সময় ঈশার বাবা ব্যস্ত থাকায় তার মা বাড়িতে একবার ফোন করলেন। ঈশার গলা শুনে আশ্বস্ত হলেন। ঈশার বাবাও চলে এসেছিলেন। ঈশার মা ফোন রেখে বললেন – "তোমার মেয়ের কাণ্ড দেখ। সে ফুলঝুরি ফাটাচ্ছে একা একা। আমি বকেছি, তাড়াতাড়ি চল।"

মায়া

ঈশার বাবা বললেন – "এই জন্যেই এখানকার ছেলে-মেয়েরা ইন্ডিপেনডেন্ট হয়না। বিদেশের মা-বাবাকে দেখে শে..." কথাটা শেষ হওয়ার আগেই ঈশার মায়ের বাক্যবাণে বিদ্ধ হয়ে তিনি প্রসঙ্গের ওখানেই ইতি করে, মন দিয়ে গাড়ি চালাতে লাগলেন।

বাড়িতে পৌঁছেই মেয়ের নাম ধরে ডাকতে কারো সাড়া পেলেননা। নীচে সোফায় ঈশাকে বসিয়ে গেছিলেন। সেখানে তন্নতন্ন করে খুঁজে কোথাও পেলেননা। দুজনে ঈশার নাম ডাকতে উপরে দোতলায় উঠলেন। সেখানেও খুঁজে পেলেন না। দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ঈশার মা কাঁদো কাঁদো ভাবে তার বাবাকে বললেন – "কতবার বললাম আমি থাকি, কিছুতেই শুনলেনা, এখন কি হবে বল?"

ঈশার বাবা একটু চিন্তিত ভাবেই বললেন – "আরে দরজা বন্ধ কোথায় আর যাবে? এখানেই কোথাও আছে, খুঁজে দেখ।" তার মা কাঁদতে লাগলেন। ঈশার বাবা তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। এমন সময় হঠাৎ তারা ঈশার গলা পেলেন।

ঈশার বাবা–"ছাদের দিক থেকে গলাটা পাচ্ছিনা? চল তো?"

দুজনে তাড়াতাড়ি ছাদে যাবার আগেই দেখেন ঈশা দেখে তাড়াতাড়ি "মা-বাপি, তোমরা কখন এসে গেছো"- বলতে বলতে নীচে এসে গেছে।

"ছাদে কেনো গেছিলি একা একা?" – ঈশার মা।

"একা কোথায়? মায়াপিসী সঙ্গে ছিলতো।" – ঈশার

সপ্রতিভ উত্তর।

ঈশার মা – "মায়াদি এসে গেছে। ওঃ, নিশ্চিন্ত হলাম।"

ঈশা জানাল – "জানো মা, আমি তোমার ফোনটা ছাড়ার পর হাতের ফুলঝুরিটা হাত থেকে পড়ে পাশের বাজির প্যাকেটে পড়ে আগুন ধরে গেছিলো। আমি কাঁদছিলাম, তখনি দেখি মায়াপিসী এসে তাড়াতাড়ি সবকিছু সামলালো। আমাকেও আদর করল। তারপর থেকে পিসীর সঙ্গেই তো বাজি ফাটাচ্ছিলাম। ও পিসী, এসনা?"

ঈশার ডাকে তার মায়াপিসী চলে এল। তাকে দেখে দুজনেই খুব আপ্লুত। মায়পিসী লজ্জা পেয়ে বলল – "আপনারা যে কি করেন না! ও তো আমারও মেয়ে।"

"তাহলে চল সবাই মিলে চৌদ্দ প্রদীপটা জ্বেলে পূর্বপুরুষদের দেখিয়ে দিই।" – ঈশার মা বললেন।

মায়াদি একটু আমতা আমতা করে বলল – "বলছি, আমি অনেকক্ষণ এসেছি কিন্তু একবারও টয়লেট যাইনি। মুখ-হাত-পায়ে জল দিয়ে আসব?"

ঈশার মা বললেন – "সত্যিই তো, যাও যাও ফ্রেশ হয়ে এস। আমরা দুজনে মিলে করে নিচ্ছি।"

মায়াদি একটু সঙ্কোচের সাথেই চলে গেল। ঈশার মা-বাবা দুজনে মল থেকে কেনা জিনিষপত্র বার করে সাজাতে লেগে গেলেন। হঠাৎ ঈশার বাবার মোবাইলটা বেজে উঠল। তিনি ফোনটা কেটে, দৌড়ে মায়াদির নাম ধরে ডাকতে

ডাকতে নীচে গেলেন। ঘরের দরজা খোলা দেখে ধীরেধীরে ভেতরে ঢুকলেন। একটু পরেই ঈশার বাবা বেরিয়ে এলেন। ঈশাকে নিয়ে তার মাও নীচে নেমে এসেছিলেন। ঈশার মা ঘরে ঢুকে মায়াদিকে দেখতে না পেয়ে, ঈশার বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন – "কিগো তুমি এতো দৌড়ে নীচে এলে কেন? মায়াদি কোথায় গেল? কার ফোন ছিল?"

"মায়াপিসী কোথায় গেলো বাবা?"- ঈশা প্রশ্ন করল।

ঈশার বাবা হাটু গেড়ে বসে ধীরেধীরে তার মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বললেন – "মায়াপিসী আর আমাদের কাছে আসবেনা কোনোদিন। তার ছেলে জানাল সে ঐ আকাশের তারা হয়ে গেছে।" হঠাৎ-ই সারা বাড়ির আলোগুলো কেঁপে উঠলো। ■

বিস্ময়কর সংখ্যা

নাহার আলম (বাংলাদেশ)

সবটা কেমন গুলিয়ে যায়। ভাবতে পারে না বেশিক্ষণ। মাথা ঝিমঝিম করে আসে। ভাবতে চায়ও না। তবুও নাছোড়বান্দা ভাবনাটা মরেও না, সরেও না। অসহ্য লাগে দিহানের এমনপারা কষ্টটা। বুকের ভেতরটা বরফগলা নদীর মতোই, নীরব ক্ষরণ চলে সত্যিটা না জানতে পারার উদ্বিগ্নতায়।

খুব মুখচোরা স্বভাবের দিহান। বন্ধু বলতে বাল্যবন্ধু স্বচ্ছ। সেই শিশুকাল থেকেই একসাথে একগাঁয়ে এক স্কুলে... ওঠা চলা বসা গল্প হৈ-হুল্লোড় আড্ডা সব। একেবারে হরিহরাত্মা। বরাবরই ক্লাসের ফার্স্ট বয়, তবুও সে কোনো ক্লাসে কখনো প্রথম বেঞ্চে বসেনি। কোনো কোনো টিচারের ধমকে সামনে গেলেও পরের ক্লাসে আবার যথাতথা।

এ নিয়ে তাকে সহপাঠী টিচারদের কম কথা গঞ্জনা উপহাস শুনতে হয়নি। ছিপছিপে গড়নে চাপা রঙ তার। চুপচাপ, লাজুক। অনেকটা মেয়েদের স্বভাবের মতো। নিজের ভেতরেই নিজেকে মিইয়ে রাখে, গুটিয়ে রাখে সবসময়ই। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সুদীর্ঘ শিক্ষা জীবনেও তার কোনো মেয়ে বন্ধু গড়ে ওঠেনি। ওঠেনি নয় সে নিজেই চায়নি। এমনতর স্বভাবের

জন্যে তার পারিবারিক অবস্থা অনেকাংশে দায়ী তা তার বন্ধু স্বচ্ছ বোঝে। শুধু স্বচ্ছই নয় বোঝে স্থানীয় টিচাররাও। তাই টিচাররা সবসময়ই তার পাশে দাঁড়ান। সহযোগিতার হাত বাড়ান। আর স্বচ্ছতো আর্থিক শারীরিক সকলভাবেই তার পাশে ছায়ার মতো।

দিহানের বাবার বেড়ে ওঠা পালিত বাবার কাছে। বয়স যখন তিন কি চার তখন একদিন দূর গঞ্জের মেলায় পেয়েছিলেন আলতাফ তরফদার। মোটামুটি রকম গেরস্তই তিনি জমিজিরাত গবাদিপশুতে। নামডাকও কম নয় গাঁয়। তাঁর ছিল দুই সংসার, তাতে সন্তানের সংখ্যা ছিল একটা ফুটবল টিমসংখ্যা – মানে এগারো জন। দিহানের বাবা এসে ডজন পূর্ণ করল। শুরু থেকেই তার পালিত বাবার বাকি সন্তানেরা কেউই মেনে নিতে পারেনি দিহানের বাবাকে। ফলত, নানা অত্যাচার গঞ্জনা সইতে হত।

তরফদারের বড় বৌ হনুফা বেগম তাকে নিজ সন্তানের মতোই লালন করেন। গবাদি পশুর দেখভাল থেকে শুরু করে এর ওর তার টুকিটাকি ফরমায়েশসহ জমিজিরাতের কাজও সামলে তাকে স্কুলে যেতে হত। স্কুল পাসের পর বখাটেদের সঙ্গদোষে পড়া আর এগোলো না। নয় ক্লাস পড়াকালেই তরফদার বাবু গত হলেন। এবার অত্যাচারের মাত্রা বাড়লো আরও। হনুফা তার দূর সম্পর্কের এক আত্নীয়ার মেয়ের সাথে বিয়ে দিয়ে তরফদারের জীবদ্দশায় হুইল করা একচিলতে জমির ওপরই একচালা টিনের ঘর

তৈরি করে তাকে বৌ সমেত আলাদা করে দিয়ে অত্যাচারের কবল থেকে বাঁচালেন। এখন সে অন্যের জমি চাষ করে আর বাকি সময়ে যখন যেমন কাজ পায় তাই করে সংসার কোনোরকমে চালায়। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই একে একে চার সন্তানের জনক সে। সংসারের বড় ছেলে এই দিহানই। খেয়ে না খেয়ে বাবার সাথে জমিতে কাজ করে খালিপায়ে স্কুলে যেতে হতো, একজোড়া চপ্পলও কেনার সাধ্য ছিলোনা ওদের। শার্ট কাপড় তো দূর।

দিহানের ছিলো পড়ার মারাত্মক ঝোঁক। গ্রামের স্কুল পাস করেই ঢাকার এক কলেজে পড়তে গেলো সে। পাশাপাশি টিউশনি চলত চার পাঁচটা। দিহান তার সব কথা একমাত্র বন্ধু স্বচ্ছকেই বলত মন খুলে। প্রথম ঠিক কবে থেকে একটি স্বপ্ন দেখেছিলো তার দিন সন কিছুই মনে নেই। তবে প্রতি পাঁচ বছর পরপর একই স্বপ্ন দেখতে দেখতে তার দিন সন মনে আপনাতেই গেঁথে গেল। স্বপ্নে দেখা জায়গাটা দৃশ্যটাও খুব চেনা হয়ে গেল।

স্বপ্নের বিশেষত্ব ছিল এমনটা, একটি নির্জন সুনসান পাকা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সোনালিরঙের জামা পড়া একটা মেয়ে, তার একহাতে তাজা বকুলের মালা আরেক হাতে এক বেড়ালছানা। মৃদু হাসিমাখা মুখে দাঁড়িয়ে থাকত সে। কিছু দূরে পেছনে ধোঁয়ার এক বিশাল দরোজা মতো। দিহান এগিয়ে কাছে যেতেই সেও ধীর পায়ে পিছিয়ে যেতে

যেতে ধোঁয়ার সে দরোজায় হারিয়ে মিলিয়ে যেত। সে ধোঁয়ার ওই চৌকাঠ মাড়াতে গেলেই ঘুম ভেঙে যেত। তার মুখচ্ছবিটা ভীষণ মায়াময়ী, পবিত্রতার প্রতিমূর্তি যেন।

প্রতিবারই স্বপ্ন দেখার পর, বেশ অনেকদিনের জন্যে স্বপনচারিনীর কথা ভেবে শয়নে স্বপনে ধ্যানে জাগরণে নিবিষ্ট হয়ে থাকত সে। সময়ের বিরতিতে আবার তা এক সময়ে ফিকেও হয়ে যেত। দিহান তার প্রায় দশ বছর বয়সের সময় থেকে এই একই ধারায় একই স্বপ্ন দেখে দেখে এতোটাই পরিচিত আর অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে – তার শুরু থেকে শেষ সব দৃশ্যই আগাম জানা। তবুও তা বারংবার জানা দেখার এক অদম্য আকুলতা তাকে গ্রাস করে রাখত। অদ্ভুত এটাই যে, দিন তারিখ ঠিক থেকে শুধু সনটা বদলে যেত।

৫/৫/... মানে, প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অন্তর মে মাসের পাঁচ তারিখ ঠিকই থাকত শেষের সনটা কেবল পাল্টে যেত। বদলে যেত স্বপ্নচারিনীরও ছোট অবস্থা থেকে কিশোরী হয়ে যুবতী হয়ে যাওয়াটাও। ঠিক দিহানের বয়সের সাথে তাল রেখে তারও বেড়ে ওঠা, সেই একই স্বপ্নে একই জায়গাতেই।

পোশাকেরও যৎকিঞ্চিত বদল হতো বয়সের সাথে মিল রেখে। শিশুকালে সোনালি রঙের ফ্রক, কিশোরীকালে সেলোয়ার-কামিজ, আর যুবতীকালে শাড়ি। রঙটা কিন্তু ঠিকই থাকত। এবং সেই সাথে বেড়ালছানাটাও বড় হয়ে যুবতীর

কালে বেশ পরিপূর্ণ এক বেড়ালে পরিণত হল। স্বপ্নের সাথে সংখ্যার এই বিস্ময়কর সমীকরণটা দিহানকে বেশ ভাবাতো। মেলাতেই পারত না সে। খুব ভাবত। খুউব। একা একাই। স্বচ্ছকেও ভাবাত এটা। সে নিজের মতো করেই ব্যাখ্যাও দাঁড় করাত। তা সমীকরণের বিরোধিতা করত জেনেও দিহানকে শান্ত রাখতেই বলত বিরোধী সেসব কথা।

পড়াশোনা শেষ করে, দিহান সরকারি চাকরিতে জয়েন করেছে তা প্রায় সাড়ে চার বছর হল। চাকরির প্রথম বছর থেকেই বিয়ের তাড়া আসছিল। করি করছি করবো বলে বলে বার কয়েক বছর পার করলেও, এবছর আর এড়াতে পারা গেলনা। বিয়ের তোড়জোড়ে, কনে দেখা থেকে বিয়ে করাটা বেশ তাড়াতাড়ি সময়েই ঘটে গেল। চাপ এল স্বচ্ছের পক্ষ থেকেও। সে ভাবত তাতে করে স্বপ্নটা আর না-ও দেখতে পারে... ওতে করে তার অকারণ মেন্টাল চাপটাও কমবে। সে ভাল থাকবে।

কেমন করে ঠিক সেই সন তারিখে, মানে মে মাসের পাঁচ তারিখে বিয়ে হল। বাসর রাতে যথারীতি সেই স্বপ্ন। তবে এখনের সে স্বপ্ন আমূল বদলে গেল। দিহান দেখতে পেল, সে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে তবে পোশাকটা সোনালি নয়, সাদা শাড়ি, চুলগুলো এলোমেলো হাতে ধরা তাজা বেলির মালাটাও শুকিয়েছে মনে হল অনেক দিন। বেড়ালটা উধাও, মুখে সেই লেগে থাকা মিষ্টি হাসিটাও নেই, কেমন মলিন

বিমর্ষ আহত... চোখজোড়ায় জলের রেখা স্পষ্ট। রাতের পূর্ণিমার আলোয় তা চিকচিক করছে, চোখের পাতা স্থির। এই পোশাকে এমন অবস্থায় তাকে দেখে, দিহানের বুকটা নিজের অজান্তেই কঁকিয়ে উঠল, ধুকপুকানি বেড়ে গেল। সে ছুটল প্রতিবারের মতো এবারও তার কাছে। এর আগে কখনোই স্বপ্নচারিনী কথা বলেনি, দিহান শুনতে পায়নি তার কণ্ঠস্বর। ছুটতে ছুটতেই সে শুনতে পেল অস্ফূটস্বরে সেই নারী তাকে বলছে, "ভাল থেকো, আমি দিলরুবা।"

কিন্তু কী আশ্চর্য! এবার সে আর পেছনে সরে যাচ্ছে না। ঠায় দাঁড়িয়ে। দিহান ঊর্ধ্বশ্বাসে তার কাছে ছুটে গেল। কাছে পৌঁছে তাকে ছুঁয়ে দেখল। বরফের মতো হাড় হিমকরা ঠাণ্ডা এক শ্বেতপাথরের মূর্তি। বুক ঠেলে কান্না এল গোঙানির মতো করে। আওয়াজ শুনতে পেয়ে তার সদ্য বিয়েকরা বৌ জাগিয়ে দিল।

মেয়েটার নামটা বারকয়েক মনে মনে নামতার মতো আওড়ালো দিহান, যাতে ভুলে না যায়। পরদিনই স্বচ্ছকে সে জানাল সব কথা। কণ্ঠস্বর তার ধরে এলো স্বপ্নটা বলার সময়। কে এই দিলরুবা? তা জানার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল দিহান, স্বচ্ছরও একই অবস্থা। পরিচিত স্বজন বন্ধু কলিগ আত্মীয় সবার কাছেই খোঁজ চালাল তারা। সেই সাথে গুগল ফেসবুক টুইটার হোয়াটস অ্যাপসহ সারা ভার্চুয়াল জগতেরও কোথাও তারা খোঁজা বাদ রাখল না।

কিন্তু না! পেলো না কোথাও ওই চেহারায় ওই নামের কাউকেই দেখতে। এই খোঁজাখুঁজির মাঝে কেটে গেল আরও বেশ কিছু বছর। আজ দিহান পঞ্চান্ন বয়সী প্রবীণ। তার সংসার জীবনে তিন তিন সন্তানের সফল জনক সে এখন। বিয়ের রাত থেকে প্রায় বিশ বছর সে স্বপ্ন আর দেখেনি সে। তবে অপেক্ষা ছিল, আকুলতা ছিল, সে দিন সে তারিখের মাঝে।

গতকাল তাদের বাইশতম বিবাহবার্ষিকীর রাতে সেই স্বপ্ন। আবার এল সে। তবে শেষবার মানে বিয়েররাতে দেখা সেই বরফের মূর্তিবেশী নারী নয়, আজ সে এল কালো পাথরের মূর্তি হয়ে। তার চারপাশ ধোঁয়ার বলয়ে বেষ্টিত ছিল, আর তার সারা গা জুড়ে ছিল অসংখ্য মৃত জোনাকি। চতুর্পাশের আঁধারের গাঢ় গন্ধে শ্মশান নীরবতায় ভয়ঙ্কর। দিহান সে ধোঁয়ার বলয়ের কাছে যেতেই শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল তার। শব্দে তার বৌ জাগিয়ে তোলে।

ঘুম ভাঙার পর থেকেই বিষণ্ণতার ঘোর কাটছেইনা, রহস্যের জট খুলতে না পারায়। কে ছিল এই দিলরুবা? কেন সারাজীবন ছিল এমন পাশে পাশে? তার সাথে সাথে? কাছে এসেও কেন আসল না? ভাবে, ভাবতেই থাকে। অবিরাম অন্তহীন সে ভাবনা কুরে কুরে খায় হাড় মজ্জায়, মনে মগজে। স্বচ্ছও ভাবে, দিহানের ভাবনা তাকেও ছাড়েনা। ভাবতেই থাকে ক্রমাগতই। ভাবনারা থৈ পায় না, সমাধানও মেলে না।

রহস্যময় প্রশ্নেরা কুল-কিনারাহীন! উত্তরবিহীন... ■

সবিনয় নিবেদন

‘গুঞ্জন’ কেমন লাগল তা অবশ্যই আমাদের জানাবেন। আর আপনার লেখা গুঞ্জনে দেখতে হলে, আপনার সবচেয়ে সেরা (আপনার বিচার অনুযায়ী) এবং অপ্রকাশিত লেখাটি আমাদের ‘ই-মেল’ (contactpandulipi@gmail.com) এ পাঠিয়ে দিন (MS Words + PDF দু’ট ফরম্যাটই চাই)। সঙ্গে আপনার একটি পাসপোর্ট সাইজের ছবিও অবশ্যই থাকা চাই – সাইজঃ ৩৫ mm (চওড়া) X ৪৫ mm (উচ্চতা); রিসল্যুশনঃ 300 DPI হওয়া চাই। আর Facebook এর ‘পাণ্ডুলিপি’ ‘গ্রুপে’ত অবশ্যই আপনার নিয়মিত উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। তবে লেখা অনুমোদনের ব্যাপারে বিচারক মণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

বি.দ্র.: এপ্রিল সংখ্যার লেখা পাঠানোর শেষ তারিখঃ ১৫ ই মার্চ, ২০২০।

কল্প বিজ্ঞান

অন্য পৃথিবীর পদ্ম বাগান

স্বাগতা পাঠক

পর্ব-১

এই ট্রেনটা মিস করলে, শ্রাবন্তীর আজ বাড়ি ফিরতে রাত দু'ট বাজত। আজ পেসেন্টের এত চাপ ছিল যে শেষমেষ নার্সিং হোম থেকে বেরোতে, ওর পৌনে দশটা বেজে যায়। রেবা-দি আজ না আসার জন্য কাজের পুরো চাপটা শ্রাবন্তীর ওপর পড়ে। তারপর কোনো রকমে ছুটতে ছুটতে এসে ও ট্রেনটা পেল। শিয়ালদহ থেকে চাঁদপাড়া প্রায় আড়াই ঘণ্টার যাত্রা। এমনিতেই শীতকাল তাতে এই রাতের সফর। ভাল করে উলেন স্কার্ফটা কানে জড়িয়ে, ছুটে গিয়ে ও উঠল শেষ লেডিস কামরায়। খুব একটা বেশী ভিড় ছিল না ট্রেনে, যদিও বনগাঁ লোকালের দুর্নাম আছে দম বন্ধ করা ভিড়ের জন্যে। তবে আজ শনিবার তার ওপর রাত, তাই ট্রেনটা ফাঁকা বললেই চলে।

শ্রাবন্তী কোলকাতার একটি নামী নার্সিংহোমের নার্স, আজ চার বছর সে এই নার্সিংহোমে কাজ করছে। ওর কাজের রেকর্ড খুব ভাল, এবং নিজের কাজের প্রতি খুব দায়িত্ববান মেয়ে শ্রাবন্তী। তাই হাসপাতালের সকলেই ওকে

খুব ভালোবাসে। রোজ সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টায় ওর ছুটি হয়ে যায়। তবে আজ একজন নার্সের অনুপস্থিতির জন্য কিছুটা বেশী কাজ ওর ঘাড়ে আসে, তাই ওর এই ঝক্কি। বাড়িতে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছে ফিরতে রাত হবে।

ট্রেনে উঠে, একটা বসবার সিটও ও পেয়ে গেল। দুর্গানগর স্টেশন ছাড়তেই জানালার পাশে শ্রাবন্তীর জায়গা হল। শীতের রাতে জানালা খুলে হাওয়া খাওয়ার কোনো ইচ্ছে ওর নেই। শুধু ক্লান্তিতে ভরা এই শরীরটা একটু জিরিয়ে নিতে চাইছে। তাই ও মাথাটা এলিয়ে দিল জানালার ধারে। এখনও অনেকটা পথ বাকি, প্রায় দুই ঘণ্টা। তাই একটু ঘুমিয়ে নেবে বলে ঠিক করল ও। ট্রেনের দুলুনির সাথে কখন যেন দেখতে দেখতে ও ঘুমিয়েও পড়ল।

(২)

কিন্তু হঠাৎ করেই একটা বিশ্রী ঝাঁকুনি দিয়ে ট্রেনটা দাঁড়িয়ে পড়ল। ঝাঁকুনিটা বেশ বড় রকমেরই ছিল, সেটার জেরেই শ্রাবন্তীর ঘুম ভেঙে গেল।

চোখ মেলে ও এদিক সেদিক দেখতে থাকল। কোথায় আছে সেটা বুঝে উঠতে ওর বেশ কিছুটা সময় পেরিয়ে গেল। অবাক হয়ে ও নিজেকে আবিষ্কার করল একটা শূন্য ট্রেনের কামরায়। কিছুক্ষণের জন্য ওর মনে হল, শুধু এই কামরাতেই না, বোধ হয় এখন এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীতেই ও একা। হঠাৎ করেই ওর ভয় করতে শুরু করেছে, তবে

কি ও চাঁদপাড়া স্টেশন ছাড়িয়ে বনগাঁতে চলে এল! তবেই সর্বনাশ। কাঁধে ব্যাগটা নিয়ে, গুটি গুটি পায়ে ও এগিয়ে গেল ট্রেনের দরজার কাছে। দরজা থেকে মুখ বাড়িয়ে বাইরেটা দেখার চেষ্টা করতে লাগল। কুয়াশায় ঢাকা সমস্ত পরিবেশ, এবার শ্রাবন্তী একটু অবাক হতে শুরু করল, শীতকালে রাতে কুয়াশা পরাটা স্বাভাবিক ব্যাপার, কিন্তু এটা তো রাতের কুয়াশা বলে মনে হচ্ছে না! এটা তো ভোরের কুয়াশা। তার মানে এখন ভোর? ট্রেনে উঠে সেই যে ঘুম এল, আর এখন তা ভাঙছে? এর মধ্যে একবারও ঘুম ভাঙল না? এটা কি করে সম্ভব হতে পারে! ও কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না কি হচ্ছে ওর সাথে?

কিছুক্ষন বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকার পর, আরও একটা বিষয় ও লক্ষ্য করল, আশে পাশে কোনো জনমানব নেই। আর এই রাত-ভোরে কেই বা থাকবে! ও কি করবে বুঝে উঠতে পারছিল না, এতক্ষণ ঘুমের মধ্যে ওর কোনো জ্ঞান ছিল না, তাই কোনো চিন্তা ছিল না। কিন্তু এখন ওকে নানা রকমের চিন্তা, মানে দুশ্চিন্তা ঘিরে ধরছে। প্রথমেই বাড়িতে ফোন করে জানান দরকার, ওরা নিশ্চয়ই এতক্ষনে থানা পুলিশ করে ফেলেছে। তাই আগে ভাগে, ব্যাগ থেকে ফোন বের করে বাড়িতে ফোন করতে গিয়ে ব্যর্থ হল ও। ফোনে নেটওয়ার্ক একদম নেই। কিছুক্ষণ চেষ্টা চরিত্র করে, ফোনটা সুইচ অফ-অন করেও কোনো ফল পাওয়া গেল না।

হতাশ হয়ে শ্রাবন্তী আকাশের দিকে তাকাল। সূর্য্য উঠতে এখনও ঢের দেরি, আর সকাল না হওয়া পর্যন্ত এই ফাঁকা ট্রেনের কামরায় ওর অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই, কিন্তু ধীরে ধীরে ভোরের আলো ফুটছে, ট্রেনের দরজার কাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বাইরে দিকে তাকিয়ে ছিল শ্রাবন্তী। হঠাৎ করেই ও খেয়াল করল, আবছা কুয়াশার মধ্যে ও যেন দূরে কিছু পাহাড়ের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাচ্ছে। ভাল করে চোখটা ডলে, ও আবার দেখল, না ও তো ভুল কিছু দেখছে না। কিন্তু যদিও ও ভুল করে বনগাঁতে চলে এসে থাকে, তবে বনগাঁতে পাহাড়! সে তো সোনার পাথর বাটি, পৃথিবী উল্টে গেলেও সেটা সম্ভব না।

কিন্তু হ্যাঁ, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে পাহাড়। এবার শ্রাবন্তী রীতিমত শিহরিত হচ্ছে। ও বুঝে উঠতে পারছে না ওর সাথে হচ্ছেটা কি? এবার সাহস করে ট্রেনের দরজার কাছে কাঁধের ব্যাগটা রেখে হাতে মোবাইলটা নিয়ে ও ট্রেন থেকে নামতে গেল। অনেকটা উঁচু একটু সাবধানে না নামলে পা মচকে যেতে পারে, কারণ ট্রেনটা স্টেশনে না, মাঝ লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। শ্রাবন্তীর যেন অবাক হওয়ার পালা একে একে বেড়েই চলেছে। এটা তো এক লাইনের ট্র্যাক। আর ওদের দিকের রেললাইন কোনো ভাবেই এক লাইনের নয়, আর বনগাঁ স্টেশনতো মোটেই না। ওর বুকের মাঝে হৃদপিন্ডটা যেন খুলে বেরিয়ে

আসতে চাইল। ও এখন নিজের হৃদস্পন্দন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। ট্রেন থেকে নেমে হাত পাঁচেক এগিয়ে যেতেই ওর চক্ষু চড়ক গাছ। সেকি! ও আছেটা কোথায়? এ যেন কোনো এক স্বপ্নের রাজ্য। ওর সামনে সে এক বিরাট ঝিল, কুয়াশার জন্য পুরোটা দেখা না গেলেও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এটা বিরাট বড় একটা ঝিল। আর ওই ঝিলের পরেই কুয়াশাতে ঢাকা পাহাড়চূড়াগুলো উঁকি মারছে। আর ঝিল জুড়ে ফুঁটে আছে নানা রঙের পদ্ম ফুল – সাদা, গোলাপী, নীল, হলুদ, বেগুনি, সবুজ, মেরুন, লাল। এতো রঙের পদ্ম যে পৃথিবীতে থাকতে পারে তা শ্রাবন্তী জানতনা। না সূর্য্য উঠতে এখনও কিছুটা সময় আছে, কিন্তু ধীরে ধীরে পরিবেশ পরিষ্কার হচ্ছে আর আশপাশের জিনিসগুলো ভালভাবে দেখা যেতে শুরু করেছে। ও কিছুক্ষনের জন্য এমন মনহরন করা পরিবেশ দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। ভুলেই গিয়েছিল যে, ও ওর বাড়ির ঠিকানা ভুল করে এক জনমানবশূন্য কোনো জায়গাতে এসে পড়েছে। কোনো এক কৌতূহল বসত ও একবার ট্রেনটার দিকে ফিরে তাকাল। এবার শ্রাবন্তী খুব বেশি অবাক না হলেও, মৃদু বিস্মিত হলো, একটা বাঁকানো পাহাড়ের ছাউনীর নীচে দাঁড়িয়ে আছে ট্রেনটা। একটু ভাল করে দেখলেই বোঝা যায় সেটা। পাহাড় কেটে বানানো হয়েছে এই রেল লাইন।

কল্প বিজ্ঞান

পাহাড়ি পথে এমন রেললাইন সাধারনত থেকেই থাকে, সেটা শ্রাবন্তী শুনেছে, ইন্টারনেটেও দেখেছে। তবে কি ও ভুল ট্রেনে উঠে কোনো পাহাড়ী অঞ্চলে এসে পড়েছে? এটা কি শিলিগুড়ি বা দার্জিলিং? প্রশ্নগুলো ওর মাথার মধ্যে হিজিবিজি খেলা করতে লাগল। আবার নিজের বোকামিতে নিজেই বিরক্ত হল, সেটা কি করে সম্ভব! শিয়ালদহ হোক বা হাওড়া... দার্জিলিং কখনো মাত্র ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে আসা সম্ভব নয়। ছোটো বেলায় বাবা মায়ের সাথে ও দার্জিলিং গিয়েছিল। আর তাছাড়া দার্জিলিঙে এমন কোনো জায়গা আছে বলে ও কষ্মিনকালেও দেখে বা শোনেনি। এতক্ষণে ওর আরও একটি উপলব্ধি হয়েছে যে এই চত্বরে বা এই ট্রেনে ও ছাড়া আর অন্য কোনো মানুষ নেই, হয়ত বা ট্রেনের চালকও নেই, অদৃশ্য কোনো টানে চলছে এই ট্রেন। সূর্য্যের আলো না ফোঁটা অবধি ও নিরুপায়।

এখন ওর কাছে দুটো পথ – হয় ট্রেনে উঠে নিজের জায়গাতে ফিরে গিয়ে, বসে বসে আবার ঘুমের দেশে পারি দেওয়া, আর না হলে হঠাৎ করেই ওর এই রোমাঞ্চ মিশ্রিত অবিশ্বাস্য ভুল ভ্রমণের মজাটা – সম্পূর্ণ না হলেও আংশিক ভাবে – লুটে পুটে নেওয়া। এতক্ষনে শ্রাবন্তীর মন থেকে ভয় এবং চিন্তা দুটোই চলে গেছে। যদিও এটা স্বাভাবিক না,

কিন্তু শ্রাবন্তী নিজেও যে স্বাভাবিক কোনো ঘটনার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তেমনটাও তো নয়।

ট্রেনেলাইনের ধার বরাবর ঝিলের পাশ ধরে এবার সে হাঁটতে শুরু করল। ঝিলের চারপাশে মন মুগ্ধ করা রং বেরঙের থাকে থাকে ফুঁটে থাকা পদ্ম ফুল দেখে, শ্রাবন্তীর মন খুশিতে ভরে উঠছিল। হঠাৎ করে ওর মনে হল, হাতের মোবাইলটা ফোন করার কাজে না লাগলেও, এই মুহূর্তে এই সুন্দর পরিবেশের এই অতীব মায়াবী রূপকে ফোন মেমোরিতে সেভ করার কাজে এটা লাগতেই পারে। গোটা কতক ছবির সাথে, পনেরো মিনিটের একটা ভিডিও সে তুলল। এর মধ্যে পাহাড়ের বুক চিরে উঠছে রক্তিম সূর্য্য। আশেপাশে কত পাখির ডাক। কত ধরনের পাখি! এমন সব অদ্ভুত সুন্দর পাখি শ্রাবন্তী আগে কখনো দেখেনি। দিনের আলো ফোঁটার সাথে সাথে তার মনে মনে পাগল হয়ে যেতে লাগল, এমন সৌন্দর্য্যের সম্মুখীন হয়ে। এবার ওর হুঁশ ফিরল ট্রেনের হুইসলে, মনে হয় সিগন্যাল পেয়েছে, ছাড়বে ট্রেন। দৌড়ে ট্রেন ধরতে যাবার জন্য উদ্যত হবে, এমন সময় ওর মনে হল – 'জানিনা এই স্বপ্নপুরী কোথায়? আর কোনোদিনও এইখানে আসতে পারব কিনা? তাই এই সুন্দর পদ্ম বন থেকে কটা পদ্ম নিয়ে যাই।' ও দৌড়ে, ঘাস পাতা পেরিয়ে নেমে গেলো ঝিলের জলে, ঝিলের ধার ঘেঁষেই থাকে থাকে পদ্ম ফুঁটে আছে, এক বারেই চারটে ফুল তুলে

নিল শ্রাবন্তী। লাল, নীল, হলুদ আর গোলাপী, শুধু সবুজ পদ্মটা একটু হাতের নাগালের বাইরে ছিল, হাঁটু জলে নামলেই ও ওটা পাবে, তাই কিছু না ভেবেই নেমে পরল আরও কিছুটা। হাঁটুর উপর অবধি তার জলে ডুবে গেল। এবার সে হাতের নাগালে পেল, সবুজ পদ্মটা। ওটা ছিঁড়ে নিয়ে উঠে আসতে যাবে, এর মধ্যেই ওর পা-টা গেলো পাঁকে আটকে। দেখতে পেল ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। শ্রাবন্তী প্রাণপণে উঠে আসতে চাইছিল। কিন্তু সে যেন আরও বেশি করে পাঁকের নীচে গেঁথে যাচ্ছিল। ট্রেনটা ওর চোখের সামনে থেকে ধীরে ধীরে দ্রুত গতি নিতে লাগল। না শ্রাবন্তীর আর কিছু ভালো লাগছে না, এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কিছুক্ষন আগে যেটা ওকে নেশার মত টানছিল, সেটা এখন ওর কাছে বিষ মনে হচ্ছে। একবার শেষ চেষ্টা করে নিজেকে টেনে বের করে আনতে চেষ্টা করল ও।

(৩)

"না.আ.....হা... ট্রেনটা চলে গেল..." কথাটা বলে ধড়ফড়িয়ে উঠল শ্রাবন্তী, কি ভয়ংকর সুন্দর স্বপ্ন দেখছিল। চোখ খুলতেই সে অনুভব করল, ট্রেন ছুটে চলেছে দ্রুত গতিতে, ট্রেনের প্যাসেঞ্জার একেবারে কমে এসেছে হাতে গোনা, দুই বা তিন জন আছেন। ঘুম ঘুম চোখে পাশে বসে থাকা এক বৃদ্ধাকে ও জিজ্ঞেস করল - "কোন স্টেশন আসছে গো মাসি?"

বুড়ি কাঁপা কাঁপা গলায় বলল চাঁদপাড়া। শ্রাবন্তী বলল যাক ঠিক সময়ে ঘুম ভেঙেছে না হলে আজ খুব মুশকিলে পড়তে হত। শ্রাবন্তী এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না এটা একটা স্বপ্ন ছিল। এমন জীবন্ত স্বপ্ন আগে কোনোদিন সে দেখেনি। আর একটু বাদেই চাঁদপাড়া স্টেশনে ঢুকবে গাড়ি। শ্রাবন্তী এখনও তার স্বপ্নের ঘোর থেকে বেরতে পারছেনা। ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে, সে উঠবে এমন সময় তার চোখে পড়ল তার উল্টো দিকের সিটের নীচে, সেখানে পড়ে আছে একগোছা রঙিন পদ্মফুল – লাল, নীল, হলুদ, গোলাপী আর সবুজ। শ্রাবন্তীর সারা শরীর জুড়ে যেন একটা ভয়ানক শিহরণ খেলে গেল। নীচু হয়ে ফুলের গোছাটা তুলতে গিয়ে, চমকে উঠল সে, তার পরনের চুড়িদারের কামিজটা ভেজা, শুধু ভেজা নয় – তাতে কাদা মাটিও লেগে আছে বিশ্রী ভাবে, এবং ভিজে ভাবটা ছড়িয়ে গেছে হাঁটুর ওপর পর্যন্ত।

(৪)

ঘড়ির কাঁটায় রাত তিনটে, কোনো ভাবেই দুই চোখের পাতা এক করতে পারছে না শ্রাবন্তী। হঠাৎ ওর মনে পড়ল মোবাইলে তোলা ছবিগুলোর কথা। তাড়াতাড়ি উঠে ফোনটা ব্যাগ থেকে বের করে ও দেখল ফোন গ্যালারী। না, এটা নিছক স্বপ্ন নয়। সমস্তটাই বাস্তবে ঘটছে ওর সাথে।

সেই মুহূর্তে কিছু কথা ওর মাথায় হঠাৎ করেই জাঁকিয়ে বসল, বিশেষ কিছু শব্দ, "প্যারালাল ইউনিভার্স", "টাইম ট্রাভেল" ইত্যাদি। যেগুলো সে আজ পর্যন্ত শুনেছে আর ইন্টারনেটে বা কোনো কল্পবিজ্ঞানের গল্পের বইতে পড়েছে। কিন্তু আজ ও নিজে এই অতীব অবিশ্বাস্য রোমাঞ্চকর একটি অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে কিছুটা সময় পার করে এসেছে। ও "সময়ের যাত্রা" করে পারি দিয়েছিল কোনো এক "সমান্তরাল মহাবিশ্বে"।

ঘরের উত্তর দিকের জানালার পাশে রাখা টেবিলের উপর ফুলদানির দিকে চোখ ফেরালো শ্রাবন্তী, সেখানে শান্তভাবে বিরাজ করছে "অন্য পৃথিবীর পদ্মবাগান" থেকে আনা, পাঁচটি ভিন্ন রঙের সতেজ পদ্মফুল... ...ক্রমশ ■

গুঞ্জনের আগামী সংখ্যাগুলির বিষয়বস্তু*

- এপ্রিল ২০২০ ☞ নববর্ষ সংখ্যা
- মে ২০২০ ☞ শ্রমিক দিবস সংখ্য
- জুন ২০২০ ☞ বাদল সংখ্যা
- জুলাই ২০২০ ☞ মৈত্রী সংখ্যা
- অগাস্ট ২০২০ ☞ স্বতন্ত্রতা সংখ্যা
- সেপ্টেম্বর ২০২০ ☞ নৈতিকতা সংখ্যা
- অক্টোবার ২০২০ ☞ শিক্ষণ সংখ্যা
- নভেম্বর ২০২০ ☞ শিশু সংখ্যা

* বিশেষ কারণে সম্পাদক মণ্ডলী নির্ধারিত বিষয়বস্তুর পরিবর্তন করতে পারেন।

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০১৯

http://online.fliphtml5.com/osgiu/genc/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/zczy/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btzm/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/fyxj/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/tebb/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/ddla/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btss/

পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **‘গুঞ্জন’এর ২০১৯ এ প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক পুনরায় দেওয়া হল।**

পাণ্ডুলিপির প্রকাশিত গ্রন্থ